বাংলা জাতীয় মাসিক

# পরওয়ানা

www.parwana.net

জুলাই ◆ ২০২৪

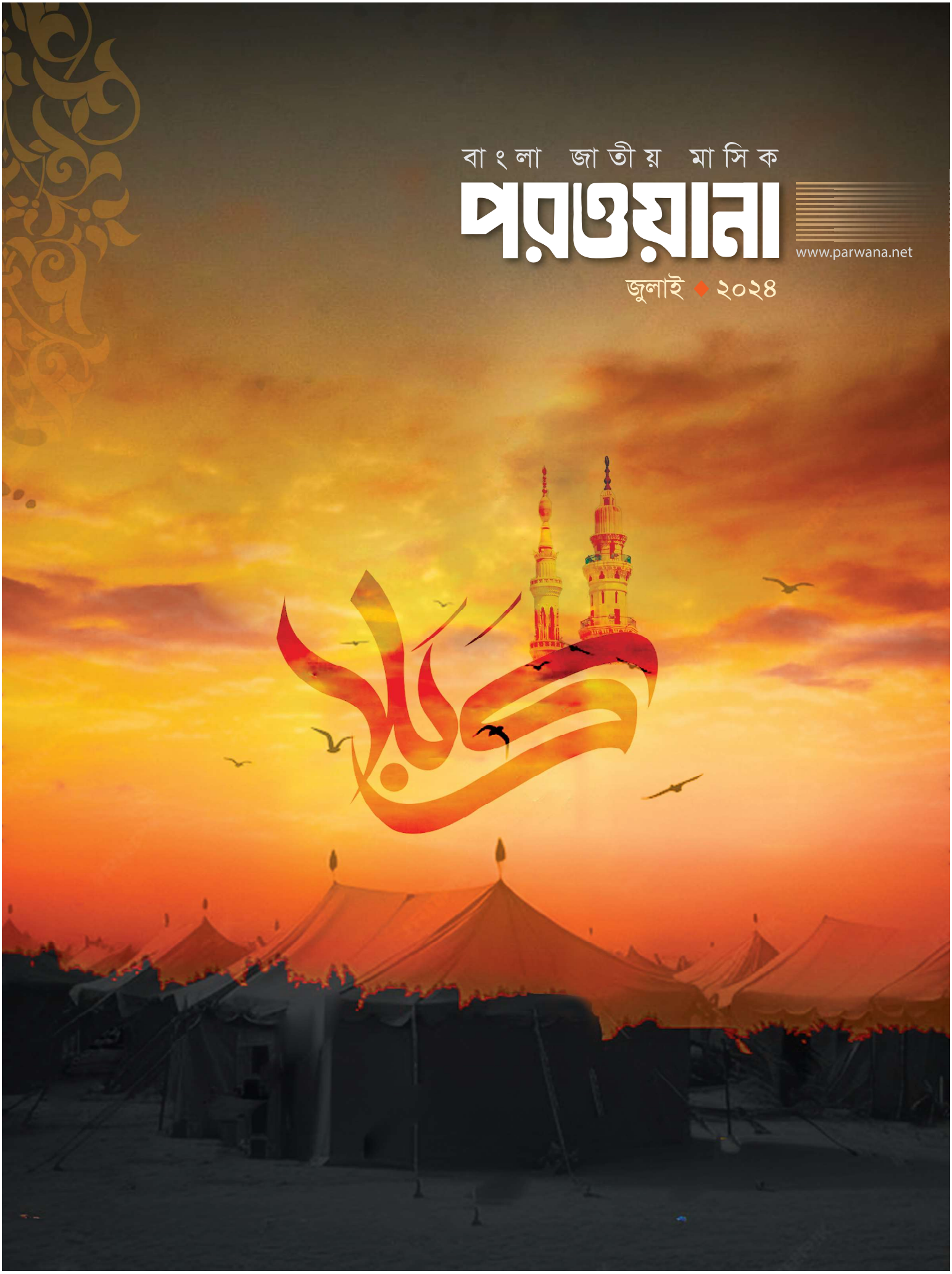

বাংলা জাতীয় মাসিক

# পরওয়ানা

৩১তম বর্ষ ■ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জুলাই ২০২৪ ♦ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১ ♦ যিলহজ্জ-মহররম ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
**মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী**

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
**আহমদ হাসান চৌধুরী**

সম্পাদক
**রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী**

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

## সূচিপত্র

**তাফসীরুল কুরআন**
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

**শারহুল হাদীস**
মুনকার বা অন্যায় প্রতিরোধের স্তর/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

**প্রবন্ধ**
প্রশ্নোত্তরে কারবালার ঘটনা/মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ০৭
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা/মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) ০৯
লিবারেলিজমে ঢাকা পড়ছে ইসলামী পরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি/মারজান আহমদ চৌধুরী ১৩
আহলুল বাইত : পরিচিতি ও মর্যাদা/এম. জুয়েল আহমদ লতিফি ১৬
বাইতুল্লাহ নির্মাণের ইতিহাস/মূল: মাহমুদ মুহাম্মদ
অনুবাদ: মুহাম্মদ যাহিন ১৮
প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, কি পেল বাংলাদেশ?/আবু তাহা ২১

**মনীষী**
জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও তাঁর ধর্মদর্শন/আ. শ. ম. বাবর আলী ২৭

**আন্তর্জাতিক**
এবার নেতানিয়াহুর নজর লেবাননের দিকে.../মির্জা গালিব ২৯
গাযায় বর্বরতার শেষ কোথায়/মুহাম্মাদ বিন নূর ৩১

**ইতিহাস-ঐতিহ্য**
ভারতে মুসলিম ঐতিহ্য/রহমান মুখলেস ৩২

**মসনবীর গল্প**
তোমার তুচ্ছ আমলও কবুল হবে যদি.../ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩৩

**নিয়মিত**
এই মাসে এই চাঁদে ৩৬
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৭
এক নজরে গতমাস ৩৯
আবাবীল ফৌজ ৪১
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।




نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের স্মৃতি নিয়ে হিজরী বর্ষের প্রথম মাস মুহাররাম বর্ষ-পরিক্রমায় আবার ফিরে এলো। সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক এই মাস তার বুকে ধারণ করে আছে অনেক ঘটনার ইতিবৃত্ত। মুহাররামের ১০ তারিখ পবিত্র আশুরার দিন। তাৎপর্যপূর্ণ এই দিন আমাদের আনন্দ, বেদনা, ভালোবাসা-মমতার সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে। এইদিনে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে কারবালার সেই মর্মান্তিক ঘটনা-যা যুগে যুগে সত্যাশ্রয়ী মানুষের মনে যেমনি বেদনার প্রলেপ মাখিয়ে যায় তেমনি চেতনার প্রাচীরেও দেয় নাড়া। সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়, আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের আদর্শ সমুন্নত রাখতে দুশমনের ঔদ্ধত্যের মুকাবিলায় জীবন বিপন্ন করে হলেও মাথা উঁচু করে যে দাঁড়াতে হয়-সে শিক্ষাই পাওয়া যায় কারবালার বীর শহীদানদের আত্মদানের মাঝে। নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর ৭২ জন নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গী-সাথিদের ত্যাগ ও ঈমানের দীপ্তি আজকের বিপন্ন মুসলিম উম্মাহর জীবনের আর্তনাদকে সুমহান আদর্শিক উচ্চারণে রূপ দিতে পারে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও খঞ্জরের আঘাত ছাড়া যেদিন নবী পরিবারের সামনে অন্য কিছু ছিল না-সেই শোক-বেদনার দিনকে আমরা কেঁদে কেঁদে স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তাদের ত্যাগ ও বীরত্বকে জীবনের উপজীব্য করে নিতে পারি না কেন? সকল পার্থিব ঐশ্বর্য্য, প্রলোভন ও ভয়কে উপেক্ষা করে সত্যের জন্য, মযলুম মানবতার জন্য ইমাম হুসাইন যেভাবে নিজের জীবন, মাসুম বাচ্চাদের ও প্রিয় সাথি-সুহৃদদের জীবন উৎসর্গ করতে পারলেন; হুসাইনী আদর্শের অনুসারীদের জন্য কি এই আত্মোৎসর্গের সবক হাসিল করা জরুরী নয়?

আজ দুনিয়ার দিকে দিকে চলছে ইয়াযিদী তান্ডব। ফিলিস্তিনসহ মুসলিম বিশ্বের নির্যাতিত চিত্র ফুরাত পারের সেই কারবালাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইয়াযীদ, সীমার, ইবন যিয়াদের প্রেতাত্মারা দুনিয়ার বুকে নতুন নতুন কারবালার জন্ম দিচ্ছে। শিশু আসগরের কান্নায় আজও বাতাস ভারি হয়, মাসুম বাচ্চার খুনে মায়ের আঁচল ভিজে আজও, নওজোয়ান কাসিমরা নববধূ সাকীনার মেহদীরাঙা হাত রেখে আজও জিহাদের মাঠে পা বাড়ায়-খুনে লালে লাল হয়ে ওখানেই পান করে শাহাদতের পেয়ালা। প্রত্যেক কারবালার পরেই ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করে। শহীদী রক্তে অবগাহনের ফলে ইসলামবৃক্ষ হয়ে ওঠে সজীব। তাই নতুন কারবালার মাঠ পেরিয়ে ঈমানদারদের শহীদী ঈদগাহে জমায়েত হওয়ার এখনই সময়। যালিম, দুরাচার, ইয়াযীদদের আর সুযোগ দেওয়া যাবে না। কবি বলেছেন- উতারো সামান, দাঁড়াও সেনানী নির্ভীক-সিনা বাঘের মত/আজ ইয়াযীদের কঠিন যুলমে হয়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত/কাওমী ঝান্ডা ঢাকা পড়ে আছে স্বৈরাচারের কালোছায়ায়/পাপের নিশানি রাজার নিশান জেগে ওঠে আজ নভঃনীলায়/ফোরাতের তীরে ঘাঁটি পেতে করে ইয়াযীদ সৈন্য কুচকাওয়াজ/উতারো সামান, মওতের মত এলো কারবালা সামনে আজ/ভীরু-কাপুরুষ জীবন আকড়ি অন্তিমক্ষণ করে স্মরণ/বীর মুজাহিদ নির্ভীক বুকে করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন/হোক দুশমন অগণন তবু হে সেনানী! আজ দাও হুকুম/মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মোরা ভাঙবো ক্লান্ত প্রাণের ঘুম।

মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিকালে হুসাইনী চেতনায় জেগে ওঠার এখনই সময়। সকল দাজ্জালীয় নাগ-পাশ ছিন্ন করে তৈরি হতে হবে নতুন একটি কারবালার জন্য। প্রমাণ করতে হবে এ জাতি ভীরু নয়, বীরের জাতি। আমাদের নব চেতনার উদয় হোক কারবালার এ মাসে। হুসাইনী ঈমান যেন হয় আমাদের নিত্য সঙ্গী। আল্লাহ যেন এ উম্মাহর জন্য এক একজন উমর, খালিদ আর হামযার জন্ম দেন। যারা ফিরিয়ে আনবে রাসূলের সেই সোনালী সমাজ।

# আত্ তানভীর

## আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
## ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
**মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী**

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا– وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ– إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

**অনুবাদ: এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। তুমি এ যাবত যে কিবলাহ অনুসরণ করছিলে তাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতিত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ এমন নন যে তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র। পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৩)**

**তাফসীর:**

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এখানে امة বলে বোঝানো হয়েছে আহলে কুরআনকে, আর وسطا শব্দের অর্থ যারা উত্তম ও মধ্যম পন্থা নিয়ে থাকে। হযরত ইবন যায়িদ (রা.) বলেন, امة وسطا এমন সম্প্রদায়, যারা মধ্যম পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা নবী ও অন্যান্য উম্মতের মধ্যস্থ, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমি তোমাদেরকে ন্যায়ভিত্তিক মধ্যম পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি।[১]

তোমরা আমার নবীদের উপর, রাসূলদের উপর এবং সকল উম্মতের উপর দ্বীনের বার্তা পৌঁছানোর ব্যাপারে সাক্ষী থাকবে। আর আমার রাসূল ﷺ তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে যা কিছু প্রেরণ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে সাক্ষী হবেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.)-কে ডাকা হবে। তাঁকে বলা হবে, আমি যা কিছু দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, আপনি কি তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন? তিনি উত্তর দিবেন হ্যাঁ, এরপর তাঁর কাওমকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা বা ভীতি প্রদর্শনকারী আসেননি। তখন নবীকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার রিসালাত পৌঁছানোর কথা কে জানে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতগণ। এ হচ্ছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا আয়াতে কারীমার তথ্য। অন্য বর্ণনায় এটুকু বেশি আছে, فيدعون ويشهدون انه قد بلغ এবং অন্য এক বর্ণনায় আছে وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا بماعملتم এসবের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আবূ সাঈদ (রা.)।[২]

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে। কিয়ামতের দিন যখন নবীকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তখন আমরা নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে রিসালাতের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য নসীহতও পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, শেষ যামানার নবী তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন।[৩]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জানাযার নামায আদায় করার জন্য বের হলাম। যখন নামায শেষ হলো, লোকেরা বলল نعم الرجل লোকটি খুবই ভালো ছিল। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। এরপর অন্য একটি জানাযার নামায আদায় করার জন্য বের হলাম। যখন সকলেই নামায শেষ করল। লোকেরা বলল, بئس الرجل লোকটি খুবই খারাপ ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। তখন হযরত উবাই বিন কাব (রা.) দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি কেন প্রত্যেকবার وجبت শব্দ বললেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হবে।[৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী ওয়াজিব হলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,الملائكة شهداء الله في السماء وانتم شهداء الله في الأرض -ফিরিশতাগণ আসমানে সাক্ষী হবেন এবং তোমরা যমীনে সাক্ষী হবে। যা ই তোমরা তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, তা ই অবশ্যম্ভাবী হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন-قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ -তোমরা আমল করো, তোমাদের আমল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ দেখবেন। (সূরা তাওবাহ: ১০৫)[৫]

হযরত যায়িদ বিন আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত, অবশ্যই হযরত নূহ (আ.) এর কাওম কিয়ামতের দিন বলবে, হযরত নূহ (আ.) আমাদেরকে নবুওয়াতের খবর পৌঁছাননি। তখন নূহ (আ.) কে আহবান করা হবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি তাদেরকে দ্বীনি দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলে? তিনি উত্তরে বলবেন, জী হ্যাঁ! তারপর তাঁকে আবার বলা হবে, তোমার কোনো সাক্ষী আছে? তিনি বলবেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মতগণ আমার সাক্ষী। তারপর তাদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে হ্যাঁ, তাদেরকে পৌঁছিয়েছিলেন। তখন নূহ (আ.) এর কাওম বলবে, তোমরা কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ অথচ তোমরা আমাদেরকে পাওনি? তারা বলবে, আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে জ্ঞাত করেছেন। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। নূহ (আ.) তা সত্যায়িত করবেন

এবং তাদেরকে মিথ্যুক বলবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا। যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হবে এবং রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী।[৬]

হযরত যায়িদ বিন আসলম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতগণ বলবেন আল্লাহর কসম এই উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদ) সবাই প্রায় নবীদের মত। কারণ আল্লাহ তাদেরকে অনেক কিছু দেখার ক্ষমতা দান করেছেন।[৭]

হযরত হিব্বান বিন আবূ জবলা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত বান্দাহকে একত্রিত করবেন। সর্ব প্রথম ইসরাফিলকে ডাকা হবে। তাঁকে আল্লাহ তাআলা বলবেন আমার প্রতিজ্ঞা পৌঁছিয়েছ কি? ইসরাফিল বলবে হ্যাঁ, আমার রব। আমি জিবরাঈলের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। হযরত জিবরাইল (আ.)কে ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছিয়েছ? জিবরাইল বলবে হ্যাঁ, আমি রাসূলদের কাছে পৌঁছিয়েছি। তারপর রাসূলদেরকে ডাকা হবে। রাসূলদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, জিবরাইল কি তোমাদেরকে আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছেছিলেন? তারা বলবেন হ্যাঁ। তারপর জিবরাইলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর রাসূলদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কী করেছিলে, তাঁরা বলবেন, আমরা আমাদের উম্মতের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম। তারপর উম্মতদেরকে আহবান করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমার রাসূলগণ কি তোমাদের নিকট আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছিয়েছিলেন? এদের মধ্যে কতেক মিথ্যা বলবে আবার কতেক সত্য বলবে। তখন রাসূলগণ বলবেন তাদের ব্যাপারে আমাদের সাক্ষী রয়েছেন। তারা সাক্ষ্য দেবেন। তাদেরকে বলা হবে তোমাদের সাক্ষী কে? তারা বলবেন উম্মতে মুহাম্মদী। উম্মতে মুহাম্মদীকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি সাক্ষ্য দিবে যে, আমার রাসূলগণ তাদের স্ব-স্ব উম্মতের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে হ্যাঁ, হে আমাদের রব। আমরা সাক্ষ্য দিলাম তারা উম্মতের কাছে দ্বীনি দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন। তখন ঐ উম্মতগণ বলবে তারা কীভাবে আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে অথচ তারা তো আমাদেরকে পায়নি। তারা বলবে আমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, আমাদের কাছে আপনার প্রতিশ্রুতি ও কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাঁরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবীগণ তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন। আপনি যে প্রতিশ্রুতি আমাদের সাথে করেছেন সেই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলাম। তারপর 'রব' বলবেন তারা সত্য বলেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا আয়াত নাযিল করেন। الوسط এর অর্থ হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফ। হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার উপর্যুক্ত বাণী সম্পর্কে বলেন, এসব লোকেরা কিয়ামতের দিন আশ্চর্য হয়ে বলবে, এ সম্প্রদায় তো আমাদের সময় ছিল না। অথচ তারা আমাদের রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে আর আমরা নবীগণের নিয়ে আসা বিষয়সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি। তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে।[৮]

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এবং রাসূল তাদের সাক্ষী হবেন, যেহেতু রাসূলের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করেছে।

হযরত ইবন যাইদ (রা.) لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, রাসূলগণ তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন এবং তাঁরা অন্যান্য উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন। يوم يقوم الاشهاد আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেসকল সাক্ষীদের কথা বলছেন তারা হচ্ছেন এর অন্তর্ভুক্ত। এরা চার শ্রেণির হবেন-

**১. ফিরিশতা:** যারা আমল লিপিবদ্ধ করেন তাঁরা সাক্ষী হবেন কিয়ামতের দিন। যেমন কুরআন শরীফে আছে-وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد -প্রত্যেক নফস তার পরিচালক ও সাক্ষী উপস্থিত করবে বা নিয়ে আসবে এবং তা হচ্ছে কিয়ামতের দিন।

**২. নবীগণ:** তাঁদের উম্মতের জন্য সাক্ষী হবেন।

**৩. উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ:** তারা সাক্ষ্য হবেন অন্যান্য উম্মতের বেলায়।

**৪. শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ:** শরীর, চামড়াও সাক্ষ্য প্রদান করবে কিয়ামতে দিন।[৯]

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আপনি যে কিবলাহর উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কিবলাহ করেছিলাম যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছপা হয়ে যায়। তাই আমরা এ আয়াতের অর্থ এভাবে বলব, এখানে শুধু আল্লাহ একটা কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন, যা দ্বারা এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, সাহাবীদের মধ্যে সত্যিই কে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করেন এবং কে ইতস্তত করত: দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে ধর্ম ত্যাগ করে। কিবলাহ পরিবর্তন করার কারণে অনেক মুনাফিকের নিফাক প্রকাশিত হয়েছে। এবং তারা আফসোস করে বলে- মুহাম্মদের কী হয়েছে? একবার এদিকে আরেকবার অন্যদিকে নামায পড়ছেন অর্থাৎ এক একবার একেক দিককে কিবলাহ নির্ধারণ করছেন। আবার মুসলমানদের মধ্যেও অনেক ছিল, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদীনায় আগমন করার আগে প্রায় তিন বৎসর বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে নামায পড়েছে এবং রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের পর প্রায় ষোল মাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে নামায আদায় করেছেন। তারা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস যদি আসলে কিবলাহ না হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের তো নামায আদায় হয়নি। আমাদের এতোদিনের আমল নষ্ট হয়ে গেল। মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে এখনো ইতস্ততার মধ্যে রয়েছেন। যার কারণে এখনো কিবলাহ নির্ধারণ করতে পারেননি।

এটা তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তা স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ -আল্লাহ তাআলা আরো বলেন

এ কিবলাহর পরিবর্তন আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন, এরা ছাড়া অন্যদের জন্য খুবই কঠিন বিষয় এবং আরো বলেন- مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

এ কিবলাহর পরিবর্তনের দ্বারা কারো ঈমান বা আমল বিনষ্ট হবে না।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ কাবাকে কিবলাহ নির্ধারণ করলেন। তখন ইয়াহুদী, নাসারা এবং মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি করতে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল, হায়রে আমাদের ভাইদেরও সর্বনাশ হয়েছে। তাদের এতো দিনের আমল তো বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু তারা এতো দিন বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে নামায পড়ছিলেন। এখন দেখা যায় বাইতুল মুকাদ্দাস তো আসলে কিবলাহ নয়। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের এসব অমূলক কথার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم।[১০]

হযরত বারা (রা.) বলেন, ايمانكم শব্দের অর্থ صلواتكم অর্থাৎ তোমাদের ঈমান বলে তোমাদের নামাযকে বুঝানো হয়েছে।[১১]

কিবলাহর পরিবর্তন যদিও ভারী কিন্তু ঐসব লোকের জন্য অতীব সহজ যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন। আর এ কথা জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের নামায বিনষ্টকারী নন।

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ কিবলাহর পরিবর্তন যদিও মুনাফিক এবং ইয়াহুদীদের জন্য খুবই কষ্টকর, কিন্তু মুমিনদের জন্য তা খুবই হালকা ও সহজ। যারা ঐ কিবলাহ অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন, তাদের নামাযের বিনিময় বিনষ্ট হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বেলায় দয়াশীল ও মেহেরবান।

১. তাবারী, ৩/১৪৫; ২. তাবারী, ৩/১৪৬; ৩. তাবারী, ৩/১৪৭; ৪. তাবারী, ৩/১৪৮; ৫. তাবারী, ৩/১৪৯; ৬. তাবারী, ৩/১৫১; ৭. প্রাগুক্ত; ৮. তাবারী, ৩/১৫১-১৫২; ৯. তাবারী, ৩/১৫৪-১৫৫; ১০. তাবারী, ৩/১৬৭; ১১. প্রাগুক্ত।



# মুনকার বা অন্যায় প্রতিরোধের স্তর

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

**হাদীসের মূলভাষ্য**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ".

رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে তোমাদের মধ্যে কোনো মুনকার তথা মন্দ কাজ দেখে সে যেন নিজ হাতে তা প্রতিহত করে। যদি এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দ্বারা যেন এর প্রতিবাদ করে। আর এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা যেন ঘৃণা করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম)

**হাদীসের মূলকথা**

আলোচ্য হাদীসে মুনকার তথা অন্যায় বা মন্দ কাজ প্রতিরোধের ধারাবাহিক স্তর বিবৃত হয়েছে। হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অন্যায় বা মন্দ কাজ প্রতিরোধের স্তর পর্যায়ক্রমে তিনটি। ১. নিজ হাতে তা প্রতিহত করা, ২. মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করা ৩. অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা।

**মুনকার বা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার গুরুত্ব**

আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে তাদের উপর অর্পণ করেছেন কিছু বিশেষ দায়িত্ব। এর মধ্যে অন্যতম হলো ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ একজনকে অপরজনের জন্য বন্ধু বানিয়েছেন। এ হিসেবেও তাদের দয়িত্ব হলো, তারা ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

-তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের মানুষদের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

-মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, নামায কায়িম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। তাদেরকে অচিরেই আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা, আয়াত-৭১)

বিভিন্ন হাদীসেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আলোচ্য হাদীসে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার গুরুত্ব ও অন্যায় প্রতিরোধের স্তর বিবৃত হয়েছে।

**মা'রুফ ও মুনকার নির্ধারণ**

মুনকার বা অন্যায় প্রতিরোধের আগে মা'রুফ তথা ভালো কাজ এবং মুনকার তথা অন্যায় বা মন্দ কাজ সম্পর্কে সঠিক অবগতি থাকা প্রয়োজন। নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মুতাবিক কিংবা অপরিপক্ক চিন্তা থেকে কোনো কাজকে ভালো কিংবা মন্দ বলা যাবে না। বরং ভালো-মন্দ পরিচয়ের মানদণ্ড হলো শরীআত। অর্থাৎ শরীআত যেটাকে মা'রূফ বা ভালো কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে তা ভালো হিসেবে গণ্য হবে আর যা মুনকার বা মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করে তা মন্দ হিসেবে গণ্য হবে।

**অন্যায় প্রতিরোধের প্রথম স্তর**

মুনকার বা অন্যায় প্রতিরোধের প্রথম স্তর হলো নিজ হাতে তা প্রতিহত করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ -যে তোমাদের মধ্যে কোনো মুনকার তথা মন্দ কাজ দেখে সে যেন নিজ হাতে তা প্রতিহত করে।

এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ নিজ হাতে পরিবর্তন বা প্রতিরোধের কথা বলেছেন। নিজ হাতে পরিবর্তন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শক্তিপ্রয়োগে তা প্রতিহত করা। যিনি সামর্থ্য রাখেন তার কর্তব্য হলো, তিনি শক্তিপ্রয়োগ করে অন্যায় প্রতিরোধ করবেন। উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ বলেন, এর মূল দায়িত্ব সরকারের কিংবা তার মনোনীত প্রতিনিধির।

ইমাম নবী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী فَلْيُغَيِّرْهُ হলো আমর তথা নির্দেশসূচক উক্তি, যা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। আর আমর বিল মা'রুফ তথা ভালো কাজের আদেশ দান এবং নাহি আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব (আবশ্যক) হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সমর্থিত। তদুপরি যে নসীহত 'দ্বীন' হিসেবে স্বীকৃত এটি এরও অন্তর্ভুক্ত। (শারহু মুসলিম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯)

তিনি আরো বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, আমর বিল মা'রুফ তথা ভালো কাজের আদেশ দান এবং নাহি আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব কেবল সরকারের জন্য খাস নয়। বরং এটি প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। তবে এ দায়িত্ব তিনি পালন করবেন যিনি আদেশ-নিষেধ করার বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। যদি এটি বাহ্যিক বিষয়াবলি, যেমন নামায, রোযা, যিনা, মদপান, ইত্যাদি সম্পর্কিত হয় তাহলে এগুলো সম্পর্কে সকল মুসলমানই জ্ঞান রাখেন। আর যদি এটি সূক্ষ্ম কোনো কাজ, কথা বা ইজতিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় এবং এতে সাধারণ মসলমানের কোনো দখল না থাকে তাহলে এসকল বিষয়ে প্রতিরোধের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানের নয়, বরং এটি

উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব। আর আলিমগণ এমন বিষয়কে মুনকার বা মন্দ হিসেবে প্রতিরোধ করবেন যা মন্দ হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। যে বিষয় মুনকার হওয়া প্রসঙ্গে ইখতিলাফ আছে সে বিষয়ে প্রতিরোধ প্রযোজ্য নয়। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০)

সারকথা হলো, আমর বিল মা'রুফ তথা ভালো কাজের আদেশ দান এবং নাহি আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সরকারের পাশাপাশি সকল মুসলমানেরও দায়িত্ব। যদি সরকার অন্যায় প্রতিহত না করেন তাহলে সাধারণ মুসলমানগণ জনমত গড়ে তুলে সরকারকে তা প্রতিহত করতে বাধ্য করবেন। এরপরও যদি সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন এবং সাধারণ মুসলমানগণও সামর্থ্য না রাখেন তাহলে করণীয় হলো, প্রতিরোধের দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা।

**আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের হুকুম**

ইমাম নববী (র.) বলেন, হুকুমের দিক থেকে আমর বিল মা'রুফ তথা ভালো কাজের আদেশ দান এবং নাহি আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ফরযে কিফায়াহ। যদি কিছু লোক এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন তাহলে অন্যরাও দায়িত্বমুক্তি লাভ করবেন। আর কেউই এ দায়িত্ব পালন না করলে যিনি ওযর বা ভয় ব্যতীত সাধ্য থাকা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব পালন করেননি এমন প্রত্যেক ব্যক্তি গুনাহগার হবেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)

অবশ্য আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়ের হুকুম বিবেচনায় তা করার কিংবা না করার আদেশ-নিষেধের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হবে। আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ আত তাফতাযানী (র.) এরূপ বলেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, যদি মুনকার বা মন্দ কাজটি হারাম হয় তাহলে তা থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব তথা আবশ্যক হবে। আর যদি তা মাকরূহ হয় তবে তা থেকে নিষেধ করা আবশ্যক নয়; বরং মুবাহ বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে ভালো কাজের আদেশ দানের হুকুম আদিষ্ট বিষয়ের হুকুমের মতো হবে। আদিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হলে তা করার আদেশ করাও ওয়াজিব হবে। আর আদিষ্ট বিষয়টি মানদূব বা মুস্তাহাব হলে তা করার আদেশ করাও মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। (আল্লামা তাফতাযানী, শারহুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা ২০০)

**অন্যায় প্রতিরোধের দ্বিতীয় স্তর**

মুনকার বা অন্যায় প্রতিরোধের দ্বিতীয় স্তর হলো, মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করা। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ -যদি এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দ্বারা যেন এর প্রতিবাদ করে। অর্থাৎ নিজ হাতে তথা শক্তিপ্রয়োগে অন্যায় প্রতিরোধের সামর্থ্য না থাকলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে।

মুখ দ্বারা প্রতিহত করা বলতে সে অন্যায়কে অন্যায় বলে ঘোষণা দেওয়া, এর বিরুদ্ধে কথা বলা, সাধারণ মানুষকে তা থেকে সতর্ক করা, সরকারের নিকট তা প্রতিরোধের দাবি উত্থাপন করা ইত্যাদি সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, তা ওয়ায-নসীহত বা বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে হোক, লিখিত হোক কিংবা মৌখিক হোক।

**অন্যায় প্রতিরোধের তৃতীয় স্তর**

মুনকার বা অন্যায় প্রতিরোধের তৃতীয় স্তর হলো, অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা যেন ঘৃণা করে। আর এটি হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। অর্থাৎ মুখ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার সামর্থ্যও যদি না থাকে তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে।

অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা অন্যায় প্রতিরোধের তৃতীয় স্তর হলেও এটি মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সাথেও শামিল। কারণ, মুনকার বা অন্যায় কাজের প্রতি মনে ঘৃণা না আসলে তা প্রতিরোধের চেতনা জাগ্রত হয় না। যখন কোনো মন্দ কাজের প্রতি অন্তর থেকে ঘৃণা আসবে তখন ব্যক্তি প্রথমে তা শক্তিপ্রয়োগে প্রতিরোধের চিন্তা করবে, যদি তার সামর্থ্য থাকে। আর এতে সক্ষম না হলে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে। আর এতেও সক্ষম না হলে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা অব্যাহত রাখবে।

অন্তর দ্বারা ঘৃণা করাকে প্রিয়নবী ﷺ ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি কেবল অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে তার ঈমান দুর্বল। বরং এর অর্থ হলো, এই পদ্ধতি ফলাফলের দিক থেকে প্রতিরোধের অন্য পদ্ধতির চেয়ে দুর্বল। আল্লামা তাফতাযানী (র.) এরূপ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্তর পরিবর্তন করে (অর্থাৎ শক্তিপ্রয়োগে প্রতিরোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না করে কেবল মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করে অথবা মুখ দ্বারা প্রতিবাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না করে কেবল অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে) তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি সামর্থ্য না থাকার কারণে কিংবা প্রতিরোধ করতে গেলে এর চেয়ে বেশি ফিতনা হবার আশঙ্কায় (শক্তিপ্রয়োগ কিংবা মৌখিক প্রতিবাদ না করে) কেবল অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে তাহলে সে পূর্ণ ঈমানদার হিসেবেই গণ্য হবে। এ অবস্থায় ঘুমন্ত ফিতনাকে জাগিয়ে তুলবে না। (আল্লামা তাফতাযানী (র.), প্রাগুক্ত)

এখানে একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো মুনকার বা মন্দ কাজ কোনোভাবে প্রতিহত করতে না পারলেও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা বাদ দেওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে পরিবেশ-পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে কিংবা সামাজিকতার খাতিরে অন্যায়ের সাথে মিলেমিশে একাকার হওয়া যাবে না। কারণ মুনকার বা অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্টি ধ্বংসের কারণ। মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ.

-তোমাদের উপর এরূপ অনেক আমীর নির্বাচিত হবে যাদের কিছু কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু কাজ অপছন্দ করবে। যে অপছন্দ করল সে দায়মুক্ত হলো এবং যে প্রত্যাখ্যান করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলো এবং অনুসরণ করলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। (মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৪৮)

উল্লেখ্য যে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কিংবা অন্যায় প্রতিহত করা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানের উপরই এ যিম্মাদারি বর্তায়। ব্যক্তির মধ্যে কোনো মন্দ থাকলে ব্যক্তি নিজে তা সংশোধনে সচেষ্ট হবে। এটি ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব। পরিবারে নিজের স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন কিংবা অন্য কোনো সদস্যের মধ্যে কোনো মন্দ দৃষ্টিগোচর হলে তাকে মন্দ থেকে নিষেধ করা পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অন্যায় প্রতিহত করা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের অবশ্য করণীয় দায়িত্ব। অবশ্য, কোনো ভয় কিংবা ফিতনার আশঙ্কা অথবা সামর্থ্যহীনতার কারণে এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে গুনাহগার হবে না।

ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও সদুপদেশের পথ অবলম্বন করা অধিক উপকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার বিনিময়ে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোনো কিছুর জন্যও তা দান করেন না। (মুসলিম, হাদীস ৬৩৬৫)

# প্রশ্নোত্তরে কারবালার ঘটনা

## মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

(মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'ইয়াযীদী ফিতনা' মাসিক পরওয়ানার সহ-প্রকাশনী 'কলন্দর' থেকে প্রকাশের অপেক্ষায়। উক্ত বইয়ে লেখক প্রশ্ন ও উত্তর আকারে কারবালার পূর্বাপর অনেক বিষয় উপস্থাপন করেছেন, যা পাঠক সমাজকে উপকৃত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। উক্ত বই থেকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ৬টি প্রশ্নের উত্তর মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হলো -সম্পাদক।)

**০১। প্রশ্ন: কারবালার ঘটনায় রাসূল ﷺ কতটুকু মর্মাহত হয়েছিলেন?**

উত্তর: কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায় ইয়াযীদ ভক্তরা মর্মাহত না হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মর্মাহত হয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে দুটি হাদীস তুলে ধরা হলো:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا رَزِينٌ، قَالَ حَدَّثَتْنِي سَلْمَى، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم– تَعْنِي فِي الْمَنَامِ – وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا

-সালমা আনসারিয়া বলেন, আমি মদীনায় উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামার (রা.) এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। আমি বললাম, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এইমাত্র স্বপ্নে নবী ﷺ কে দেখলাম। তাঁর পবিত্র মাথা ও দাঁড়ি ধূলামলিন এবং তিনি কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কী হয়েছে? তিনি বললেন, এইমাত্র হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৭৭১)

عن ابن عباس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار اشعث اغبر بيده قارورة فيها دم قلت بابي انت وامي ما هذا؟ قال هذا دم الحسين واصحابه ولم ازل التقته منذ يوم فاحصى ذالك الوقت فاجد قتل ذالك الوقت

-হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলে পাক ﷺ কে দিনের মধ্যভাগে স্বপ্নে দেখলাম এলোমেলো চুল ও ধুলামলিন দেহ মুবারকে। তাঁর হাতে একটি পাত্র, যাতে রয়েছে রক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এটা কী? জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, এটা হুসাইন ও তার সাথিদের রক্ত। আমি আজ সকাল থেকে এটা কুড়াচ্ছি। (ইবন আব্বাস রা. বলেন) আমি সে সময় হিসাব করে দেখলাম ঐ সময়েই হুসাইন (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। (বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত, মুসনাদে আহমদ)

**০২। প্রশ্ন: কারবালার ঘটনায় ইবন উমর (রা.) এর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?**

উত্তর: কারবালার ঘটনায় ইবন উমর (রা.) এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দুটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো: ইবন আবূ নুআইম বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর নিকট ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিধানাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । শুবা বলেন, আমার ধারণা মতে সে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মাছি মারার বিধান সম্পর্কে জানতে চাইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, ইরাকবাসী মাছি মারার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, অথচ তারা রাসূল ﷺ এর নাতি হুসাইন (রা.)কে শহীদ করেছিল। আর নবী করীম ﷺ বলেন, তারা উভয়ই (হাসান-হুসাইন রা.) দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানে আমার দুই ফুল। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৫৪৩) হযরত আব্দুর রহমান বিন আবূ নুআইম থেকে বর্ণিত, এক ইরাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করল, যদি কপড়ে মশার রক্ত লেগে যায় তবে এর বিধান কী? (আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা. বলেন) সে মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা নবী করীম ﷺ এর পুত্রকে (হুসাইন রা.) শহীদ করেছে। আর আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, হাসান-হুসাইন দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানের আমার দুই পুষ্প। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস-৫৬৪৮; সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৭৭০; সুনান আন নাসাঈ, হাদীস-৮৫৩০)

**০৩। প্রশ্ন: কারবালার ঘটনাকে তুচ্ছ করে দেখার কি কোন সুযোগ আছে?**

উত্তর: আহলে বাইআত বিদ্বেষীরা ইয়াযীদের ভালোবাসার কারণে কারবালার ঘটনাকে তুচ্ছ করে দেখতে পারে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা কারবালার ঘটনাকে ধর্মের জন্য ত্যাগের চেতনা হিসেবে দেখেন। এজন্য সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বৎসরে দুটি মাহফিল করতেন। তার মধ্যে একটি মাহফিল ছিল ১০ মুহাররাম তারিখে। সেখানে হুসাইন (রা.) এর হত্যাকারীদের অপকর্মের বর্ণনা এবং হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতে উম্মে সালামা (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.)সহ সাহাবীগণ জিন পরী থেকে যে শোকগাঁথা শুনেছেন তাও আলোচনা করা হতো। (বিস্তারিত জানতে দেখুন: ফাতওয়ায়ে আযীযী, পৃষ্ঠা-২০০)

আল্লামা ইকবাল বলেন,

صدق خليل بهي هي عشق صبر حسين بهي هي عشق
معركه وجود مين بدر حنين بهي هي عشق

-ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং হুসাইন (রা.) কারবালার মাঠে যুলমের শিকার হওয়ার ছিল ইশক। বদর হুনাইনের যুদ্ধও ছিল ইশকের পরীক্ষা। রিয়াযত মেহনত ছাড়া কেউই বুযুর্গী হাসিল করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে মাহমুদ আলুসী (র.) এর বক্তব্য উল্লেখ করছি যা বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার (ইয়াযীদের) সাথে ইবন যিয়াদ, ইবন সাদ ও একটি দল রয়েছে। এদের সকলের উপর আল্লাহর লানত। তাদের সাহায্যকারী, সহযোগী এবং যারা তাদেরকে দলভুক্ত ও তাদের প্রতি আকৃষ্ট, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর লানত, যতদিন পর্যন্ত একটি চোখ হলেও আবূ আবদিল্লাহ আল হুসাইন (রা.) এর জন্য অশ্রু ঝরাবে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী)

**০৪। প্রশ্ন: ইয়াযীদ কি ইমাম হুসাইন (রা.) কে শহীদ করার নির্দেশদাতা?**

উত্তর: ইবন যিয়াদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রা.) কে শহীদ করার নির্দেশদাতা।

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ তার সফরসঙ্গীকে বলল,

أَمَّا قَتْلِيْ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيْدُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَتْلِيْ فَاخْتَرْت قَتْلَهُ،

-আমি যে হুসাইনকে হত্যা করেছি, তার কারণ হলো, ইয়াযীদ আমাকে ইঙ্গিত করেছে, তুমি যদি হুসাইনকে হত্যা না করো, তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। তাই আমি আমার হত্যা থেকে বাঁচার জন্য হুসাইনকে হত্যা করেছি । (আল কামিল, ২/২১২, তাবারী, ৪/৪০২)

ইয়াযীদ যখন ইবন যিয়াদকে নির্দেশ দিল, মক্কায় ইবন যুবাইরের উপর আক্রমণ করো। তখন ইবন যিয়াদ বলল,

لَا أَجْمَعُهُمَا لِلْفَاسِقِ أَبَدًا، أَقْتُلُ ابْنَ بِنْت رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَغْزُوْ الْبَيْت الْحَرَامَ؟

-আমি ফাসিকের জন্য তাদের দুজনকে কখনই একত্রিত করব না। আমি রাসূলের কন্যার সন্তানকে হত্যা করব আর বাইতুল্লায় যুদ্ধ করব? (তাবারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭১; তাজাল্লিয়াতে সফদার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩৯)

তাছাড়া ইয়াযীদ শাসক হওয়ার পর মদীনার গভর্নর এর কাছে যে চিঠি লিখে সেই চিঠিতেই

ইমাম হুসাইন (রা.) কে শহীদ করার ইঙ্গিত রয়েছে। যা অন্য প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**০৫। প্রশ্ন: ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতে ইয়াযীদ কি অসন্তুষ্ট ছিল?**

উত্তর: ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতে ইয়াযীদ অসন্তুষ্ট নয় বরং সন্তুষ্ট ছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর মাথা মুবারকের সাথে ইয়াযীদ যে বেআদবী আচরণ করেছিল তা থেকে। যা অন্য প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত পরবর্তী সময়ে ইয়াযীদ বাহ্যিক অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করে যা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকী ছিলো।

আল্লামা ইবন কাসীর লিখেন, ইবন যিয়াদের এহেন কাজে ইয়াযীদ তাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিরস্কার করল এবং বকাঝকা করল, কিন্তু এ জঘন্য কাজের জন্য ইবন যিয়াদকে পদচ্যুতও করল না এবং কোন শাস্তিও দিল না। এমনকি কারো মাধ্যমেও এহেন নির্লজ্জ কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়নি। (আল্লাহই অধিক জানেন) সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত হুসাইন (রা.) এর হত্যাকাণ্ডে দুঃখিত হওয়া, কারণ তিনি ছিলেন মুসলমানদের সরদার, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আলিম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শ্রেষ্ঠ কন্যার অত্যন্ত আদরনীয় সন্তান। হুসাইন (রা.) ছিলেন ইবাদতকারী, বীর পুরুষ ও দাতা। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড)

ইমাম সাদুদ্দীন তাফতাজানী (র.) বলেন,

**والحقُّ أن رضا يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه**

-আর প্রকৃত কথা হলো হুসাইন (রা.) এর হত্যার প্রতি ইয়াযীদের সন্তুষ্টি ও এর কারণে খুশি হওয়া এবং আহলে বাইতকে অপমানিত করার বিষয়টি অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। (শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়া, পৃষ্ঠা-৩৫২)

**০৬। প্রশ্ন: ইয়াযীদ হুসাইন (রা.) এর মাথা মুবারক দেখে কেঁদে ফেলে। তাহলে ইয়াযীদ হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতে কিভাবে সন্তুষ্ট ছিল?**

উত্তর: দেওবন্দী আলিমদের মুনাযিরে আযম আমীন সফদর উকাড়ভীকে এক ব্যক্তি এমন প্রশ্ন করায় তিনি তার উত্তরে বলেন,

আপনি বলেছেন, ইয়াযীদ হযরত হুসাইন (রা.) এর মাথা দেখে কেঁদে ফেলে। এর পক্ষে আপনি আল ইসাবা ১/৯০ এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি আল ইসাবাতে হযরত হুসাইন (রা.) এর জীবনীতে এই কথা পাইনি। তবে তাবারী ৪/৩৫২ তে এই বর্ণনা আছে। কিন্তু তার রাবী তো আপনার আলোচিত ব্যক্তি আবূ মিখনাফ। প্রথমে তো বর্ণনাই সহীহ নয়। এরপর ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের মতো কেঁদে লাভ কী? (তাজাল্লিয়াতে সফদার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৭)

মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান (র.) বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন, এগুলো ইয়াযীদের মনের কথা, না শুধুমাত্র মৌখিক কথা। আর তার অশ্রু, দুঃখ ও অনুশোচনার অশ্রু, না রাজনৈতিক অশ্রু? হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাইয়েরাও অশ্রুপাত করেছিল। وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ -তারা সন্ধ্যাকালে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হলো। (সূরা ইউসুফ; তারীখে ইসলাম)

ইয়াযীদ যেখানে হযরত হুসাইন (রা.) কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে সেখানে রাজনীতিবীদ ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতে অসন্তুষ্ট ছিল বলা মুর্খতার পরিচয়। মূলত ইয়াযীদ অসন্তুষ্টির ভান করেছিল। যাতে সাধারণ মানুষ তার উপর ক্ষুব্ধ না হয়। তার রাজত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

**০৭। প্রশ্ন: হযরত হুসাইন (রা.) এর মাথা মুবারক এবং তাঁর পরিবারের সাথে ইয়াযীদ ও তাঁর বাহিনী কী আচরণ করেছিল?**

উত্তর: ইমাম আবুল ফারায ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, ইয়াযীদের কাছে এরপর আলী ইবন হুসাইনসহ নারী ও শিশুদের ডেকে আনা হলো। তাঁদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে যখন ইয়াযীদের সামনে আনা হলো, আলী ইবন হুসাইন (রা.) বলেন, ওহে ইয়াযীদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তিনি যদি আমাদের এভাবে বাঁধা দেখতেন, তাহলে কি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হতেন না?

তখন ইয়াযীদ বলল, আলী! তোমার বাবাই তো আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আমার সাথে শাসনক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাকে নিয়ে যা করেছেন, তা তো দেখেছ।

তখন সিরিয়াবাসী এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এই মেয়েটিকে আমাকে দিন। সে ফাতিমা বিনতে আলীকে বুঝিয়েছিল (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। ফাতিমা (রা.) উজ্জ্বল বর্ণের তরুণী ছিলেন। তিনি ভয়ে কেঁপে উঠে বোন যাইনাবের কাপড় আঁকড়ে ধরলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তারা বোধহয় সত্যিই এটা করে ফেলবে। তখন যাইনাব বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তোমার বা ইয়াযীদের কারোরই এটা করার অধিকার নেই।

একথা শুনে ইয়াযীদ রেগে গেল। সে বলল, তুমি মিথ্য বলছ। আমার এমন অধিকার আছে। আমি সেটা করতে চাইলে করতে পারি। যাইনাব বললেন, কখনো না। আল্লাহর কসম! এটা তোমার জন্য কখনই বৈধ নয়। তবে তুমি যদি আমাদের দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাও অথবা নতুন কোনো দ্বীনে দীক্ষিত হও, তবে ভিন্ন কথা।

এরপর তাদের সবাইকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। হুসাইন (রা.) এর মাথা আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে ছিল মদীনায় ইয়াযীদের গভর্নর। সে হুসাইন (রা.) এর মাথা গ্রহণ করেছিল। তাঁর মাথা আমর ইবন সাঈদের সামনে রাখা হলে সে তার নাকের বাঁশি স্পর্শ করেছিল। এরপর তার আদেশে হযরত হুসাইন (রা.) এর মাথা কাফন দিয়ে তার মা ফাতিমা (রা.) এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। মুহাম্মদ ইবন সাদ এমনটাই বলেছেন। (الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد)

মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন, অতঃপর ইবন যিয়াদ ভরা দরবারে ইমাম হুসাইন (রা.) এর পবিত্র দাঁত ছড়ি দিয়ে খটখটায়। সেখানে সাহাবী হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবন যিয়াদের এই বেআদবী বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজ চোখে নবী ﷺ কে ঐ ঠোঁঠে চুমু খেতে দেখেছি। বেআদবী করিস না। একথা বলে তিনি চরম আবেগে কেঁদে ফেললেন। ইবন যিয়াদ বলল, যদি তুমি জ্ঞান হারিয়ে না ফেলতে তাহলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করতাম। একথা শুনে হযরত যায়িদ (রা.) বদদুআ করে মজলিস থেকে উঠে গেলেন।

ইবন যিয়াদ এবার ইমাম হুসাইন (রা.) এর একমাত্র স্মৃতি যাইনুল আবিদীন (রা.) কে হত্যা করার নির্দেশ দিলে যাইনাব বিনতে আলী (রা.) আর্তচিৎকার করে উঠলেন এবং বললেন, হে ইবন যিয়াদ! আমাদের খান্দানের বহু মানুষকে হত্যা করেছিস। আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি তাঁকে হত্যা করতে চাইলে প্রথমে আমাকে হত্যা কর।

এই আর্তচিৎকারে অসুস্থ আবিদের জীবন রক্ষা পায়। ইবন যিয়াদ আহলে বাইতের বন্দীদের এবং শহীদদের মাথাগুলো সীমারের তত্ত্বাবধানে দামেশকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। অসুস্থ আবিদের (রা.) গলায় জিঞ্জির ও হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে এই কাফেলা ও শহীদদের মস্তক ইয়াযীদের কাছে পৌঁছে।

ইবন যিয়াদের মতো ইয়াযীদও দরবারে বসে হুসাইন (রা.) এর পবিত্র দাঁত ছড়ি দিয়ে খটখটাতে থাকে এবং নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করে-

**ابى قومنا ان ينصفونا وانصفت : قواضب فى ايماننا تقطر الدماء**

**يفلقن هاما من رؤس اعزة : علينا وهم كانوا اعق واظلما**

-আমাদের কাওম ইনসাফ করতে অস্বীকার করেছে । কিন্তু আমাদের দক্ষিণ হস্তে ধারণকৃত তরবারি ইনসাফ করেছে যা থেকে এখনো রক্ত ঝরছে।

যারা আমাদের প্রতি কঠোর সেইসব নেতাদের মুকুট বিদীর্ণ করে ফেলেছে আমাদের হাতের তরবারি। যেহেতু তারা ছিল চরম যালিম ও অত্যাচারী। (তারীখে ইসলাম)

ইমাম আবূ শামা বলেন, ইয়াযীদ আমাদের নবীজি ﷺ এর কন্যার সন্তানের সাথে যা করেছে, রাসূলুল্লাহ e এর পরিবারকে উটের কুঁজে উঠিয়ে বন্দী হিসেবে যেভাবে সিরিয়ার নিয়ে গিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয়েছে, সেসবের জন্য আমরা তাকে পছন্দ করি না। (আবূ শামা আল মাকদিসী)

# সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

মাওলানা ছালিক আহমদ (র.)

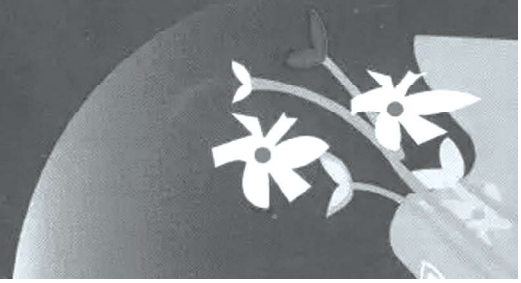

**সাহাবায়ে কিরামের পরিচয়**

الصحابة শব্দটি বহুবচন, একবচন صاحب ও صحابى অর্থ সহচর, সাথি, সঙ্গী প্রভৃতি। ইসলামী পরিভাষায় সাহাবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

الصحابى هو من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان

অর্থাৎ যিনি ঈমানের সাথে নবী ﷺ এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপরই ইন্তিকাল করেছেন তিনিই হচ্ছেন সাহাবী। কেউ কেউ বলেন,

الصحابى من رأى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان

অর্থাৎ যিনি ঈমানের সাথে নবী ﷺকে দেখেছেন এবং ঈমানের উপরই ইন্তিকাল করেছেন তিনিই হচ্ছেন সাহাবী।

তবে জমহুর উলামায়ে কিরামের নিকট প্রথম সংজ্ঞাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। কেননা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্ধ সাহাবীও ছিলেন যারা দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বাদ পড়ে যান।

**কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা**

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রিয় সহচরদের প্রশংসা, মর্যাদা ও জান্নাতের সুসংবাদ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا– ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

-আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রবর্তী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করবে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহান সফলতা। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১০০)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত من হরফটিকে تبعيض তথা আংশিক বুঝানোর জন্য সাব্যস্ত করে অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম মুহাজির ও আনসারদেরকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, ১. ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রগামী ২. অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম।

এখানে السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে মুফাসসিরীনে কিরামের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত কাতাদাহ ও সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা.) এর মতে যারা উভয় কিবলাহ অর্থাৎ বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মুকাদ্দাস এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এককথায় যারা কিবলাহ পরিবর্তনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারাই হচ্ছেন السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ। হযরত আতা ইবন আবী রাবাহ (র.) এর মতে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম শাবী (র.) এর মতে যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই হলেন السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ।

তাফসীরে মাযহারীর লেখক আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) এর মতে আয়াতে বর্ণিত من অব্যয়টি تبعيض বা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্য সাব্যস্ত না করে من হরফটি বয়ানের অর্থে ব্যবহৃত ধরে নিয়ে السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ বলতে সকল সাহাবায়ে কিরামকেই বুঝানো হয়েছে কেননা ঈমান আনয়নের দিক দিয়ে তাঁরাই হলেন মুসলমানদের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম।

মুহাম্মদ ইবন কাব কুরাযী (র.)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবা সম্পর্কে আপনি কী বলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাঁদের সবাই জান্নাতবাসী হবেন– যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। লোকটি জিজ্ঞেস করল এর প্রমাণ কী? তিনি বললেন, কুরআন কারীমের আয়াত وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ। আয়াতটি পড়ে দেখুন এতে নিঃশর্তভাবে সকল সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে رضى الله عنهم ورضوا عنه ঘোষণা করা হয়েছে তবে তাবিঈনের ক্ষেত্রে احسان এর শর্তারোপ করা হয়েছে। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

-মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাঁদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন। (সূরা ফাতহ, আয়াত-২৯)

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

-তাঁদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা ফাতহ, আয়াত-২৯)

উক্ত আয়াত থেকে দু'টো বস্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত: সাহাবায়ে কিরাম সবাই ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ছিলেন। দ্বিতীয়ত: তাঁদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

-আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নবী ﷺ ও তাঁর সহচরদেরকে অপদস্ত করবেন না। (সূরা তাহরীম, আয়াত-০৮)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

-যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনা তথা উত্তম পরিণতির ফায়সালা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ– أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا– وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰ– وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

-তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে তারা সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা যারা পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তবে উভয় দলের জন্য হুসনা তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। (সূরা হাদীদ, আয়াত-১০)

উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার তারতম্য উল্লেখ করে وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰবলে কল্যাণ ও মাগফিরাতের ওয়াদা সকলের জন্যই করেছেন। কেননা উক্ত আয়াতে বর্ণিত উভয় শ্রেণির সাহাবায়ে কিরামই আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন ও জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই তাফসীরে মাযহারীর লেখক আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের সকলই যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে রহমত ও মাগফিরাতের উপযুক্ত, উক্ত আয়াতই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্বাচিত জামাআত। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

-তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করে নিলাম তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করলাম। (সূরা ফাতির, আয়াত-৩২)

সাহাবায়ে কিরামই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ধারক ও বাহক। সাহাবায়ে কিরাম নবীদের মতো পাপ পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে তথা নিষ্পাপ না হলেও অপরাপর সকলের চেয়ে তারা মর্যাদাবান ও নাজাতপ্রাপ্ত। রাসূলে পাক ﷺ একাধিক হাদীসে তাদেরকে আকাশের তারকারাজির সাথে তুলনা করেছেন।

**হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা**

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সমষ্টিগতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথক পৃথকভাবে রাসূলে পাক ﷺ বর্ণনা করেছেন। যেমন- খুলাফায়ে রাশিদীন, আশারায়ে মুবাশশারা বিল জান্নাহ, আসহাবে বদর, উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম, বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ, আহলে বাইত, আযওয়াজে মুতাহহারাত, মুহাজির ও আনসার। এখানে কেবলমাত্র সমষ্টিগতভাবে বর্ণিত মর্যাদা সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

সাহাবায়ে কিরামই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ধারক ও বাহক। সাহাবায়ে কিরাম নবীদের মতো পাপ পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে তথা নিষ্পাপ না হলেও অপরাপর সকলের চেয়ে তারা মর্যাদাবান ও নাজাতপ্রাপ্ত। রাসূলে পাক ﷺ একাধিক হাদীসে তাদেরকে আকাশের তারকারাজির সাথে তুলনা করেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَفَعَ يَعْنِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ "النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ". (رواه مسلم)

-হযরত আবূ বুরদা (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক ﷺ একদা তাঁর মাথা মুবারক আকাশের দিকে উত্তোলন করেন আর তিনি বেশি বেশি করেই তাঁর মাথা মুবারক আকাশের দিকে উত্তোলন করে থাকেন। অতঃপর তিনি বলেন, তারকারাজি হলো আসমানের নিরাপত্তারক্ষী সুতরাং যখন আকাশে তারকারাজি বিদ্যমান থাকবে না, তখন আকাশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি হলাম আমার সাহাবায়ে কিরামের নিরাপত্তারক্ষী। যখন আমি থাকব না তখন তাঁরা বিভিন্ন আকারের ফিতনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়বে। আর আমার সাহাবায়ে কিরাম হলেন আমার উম্মতের নিরাপত্তারক্ষী। অতঃপর যখন আমার সাহাবায়ে কিরাম থাকবে না, তখন আমার উম্মতের উপর নানাবিধ সমস্যা ঝেঁকে বসবে (অর্থাৎ তারা বিদআতসহ নানা প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফলে তাদের থেকে কল্যাণ দূরিভূত হয়ে অকল্যাণ তাদেরকে পেয়ে বসবে)। (মুসলিম)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَبِّيْ عَنْ اِخْتِلَافٍ أَصْحَابِيْ مِنْ بَعْدِيْ؟ فَأَوْحٰى إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ، بَعْضُهَا أَقْوٰى مِنْ بَعْضٍ، وَلِكُلٍّ نُوْرٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ؛ فَهُوَ عِنْدِيْ عَلٰى هُدًى، قَالَ: وَأَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ؛ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. (رواه رزين)

-হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, আমার রব আল্লাহ তাআলার নিকট আমি আমার অনুপস্থিতিতে আমার সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মতবিরোধ সম্পর্কে ফরিয়াদ জানালাম। তখন তিনি ওহী মাধ্যম আমাকে জানালেন হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমার সাহাবায়ে কিরাম আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তাদের একজন অপরজনের তুলনায় শক্তিশালী এবং প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রয়েছে। সুতরাং যে কেউই তাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি গ্রহণ করবে তা আমার নিকট হিদায়াত হিসেবেই গণ্য হবে। রাসূলে খোদা ﷺ আরো বললেন, আমার সাহাবায়ে কিরাম আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায়, সুতরাং তোমরা তাদের যে কারোই অনুসরণ করবে হিদায়াত লাভ করবে। (রাযীন)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أَصْحَابِيْ فِيْ أُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِي

الطَّعَامِ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ. (رواه البغوي فى شرح السنة)

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ হলো খাদ্যের মধ্যে লবণের ন্যায়। কারণ লবণ ব্যতিত খাদ্য খাওয়ার উপযোগী হয় না। (বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَّأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبَعُوْهُمْ عَلٰى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ– (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তম পথ অনুসন্ধান করে সে যেন মৃতদের পথ অনুসরণ করে। কেননা জীবিতরা ফিতনার আশঙ্কামুক্ত নন। আর এরা হলেন মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবীরা। তারা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত নেকপ্রবণ। জ্ঞান ছিল খুবই গভীর। লৌকিকতা ছিল অত্যন্ত স্বল্প। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর সাহচর্য ও তাঁর দ্বীন কায়িমের জন্য তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হও এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। সাধ্যানুযায়ী তাঁদের চরিত্র ও স্বভাব আঁকড়ে ধরো। কেননা তাঁরা ছিলেন সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রকৃত অনুসারী। (রাযীন)

অপর একটি হাদীসে রয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَأَنِي. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيْ)

-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি যে, কোনো মুসলমান যে আমাকে দেখেছে বা আমার সাহাবীকে দেখেছে তাঁকে দুযখের আগুন স্পর্শ করবে না। (তিরমিযী)

### সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি

সাহাবায়ে কিরাম معيار حق বা সত্যের মাপকাঠি তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা। বরং তাঁরা হচ্ছেন حب رسول (রাসূলের প্রতি ভালোবাসা), تعظيم و اتباع رسول (রাসূলের প্রতি আনুগত্য) ও رسول (রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) সহ সবকিছুরই মাপকাঠি। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল আদিল্লাহর দ্বারা তা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ– غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

-আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। ঐ সকল লোকদের পথ, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের পথ নয়। (সূরা ফাতিহা, আয়াত: ৫-৭)

সূরা ফাতিহার উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সিরাতুল মুস্তাকীমের পরিচয় দিতে গিয়ে একদল পুরস্কারপ্রাপ্ত মানুষের পথকে বুঝিয়েছেন। তবে তারা কারা এ সম্পর্কে উক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট বর্ণনা না করলেও অপর আয়াতে আল্লাহ পাক তা ব্যাখ্যা করেছেন,

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ– وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقًا. (سورة نساء–٩٦)

-যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সমস্ত লোকের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন, তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককার লোকগণ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। (সূরা নিসা, আয়াত-৬৯)

আয়াতে বর্ণিত পুরস্কারপ্রাপ্ত চার দলের মধ্যে নবীদের পর উক্ত তিন দলের প্রথম সারির লোকই হলেন সাহাবায়ে কিরাম। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং বুঝা গেল, নবীগণ ও সাহাবায়ে কিরামের পথই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম এবং তারাই হচ্ছে হিদায়াতের মাপকাঠি।

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ– أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ.

-আর যখন তাদেরকে বলা হয় লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরা সেভাবে ঈমান আনো, তখন তারা বলে আমরা কি নির্বোধদের ন্যায় ঈমান আনব? জেনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না। (সূরা বাকারাহ, আয়াত-১৩)

উক্ত আয়াতে النَّاسُ দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ সময় যারা ঈমানদার ছিলেন তারা সবাই ছিলেন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম। আর সাহাবায়ে কিরামের ঈমানই হচ্ছে অপরাপর সকলের ঈমানের মাপকাঠি।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا– وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ– فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ– وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

-সুতরাং তারা যদি তোমাদের ঈমানের ন্যায় ঈমান আনে তবে তারা হিদায়াত লাভ করবে। আর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তাহলে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত। সুতরাং এখন তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৩৭)

আয়াতটিতেও পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের ন্যায় সাহাবায়ে কিরামের ঈমানকে অন্যান্যদের জন্য ঈমানের মাপকাঠি হিসেবে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম যে معيار حق বা সত্যের মাপকাঠি তা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা যেমন প্রমাণিত তেমনি অনেক হাদীসের দ্বারাও তা প্রমাণিত। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। যেমন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. (رواه ابُو داود وترمذى)

-তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে এ উম্মতের ক্রান্তিলগ্নে রাসূলের সুন্নাতের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতই হচ্ছে উম্মতের মুক্তির একমাত্র পথ।

অন্য হাদীসে রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. (رواه الترمذى)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। একদল ব্যতীত সকল দলই হবে জাহান্নামী। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কোন দল? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম যে পথের উপর আছি সে পথে যারা থাকবে। (তিরমিযী)

উক্ত হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে,

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সত্যের মাপকাঠি।

**সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা**

সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর মনোনীত দল, আল্লাহর সন্তুষ্টভাজন। তাঁরা মাসূম বা নিষ্পাপ নন। তবে তাঁদের সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনার উর্ধ্বে। আকাইদের শ্রেষ্ঠ কিতাব শরহে আকাইদে নাসাফীতে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে-

وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ اِلَّا بِخَيْرٍ

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে ভালো আলোচনা ছাড়া অন্য সকল আলোচনা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে।

সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (আল কাবায়ির)

হাফিয ইবন তাইমিয়া যিনি শাইখুল ইসলাম নামে খ্যাত, ইলমে হাদীস, তাফসীরসহ ইসলামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যার সরব পদচারণা, তার সমসাময়িক উলামায়ে কিরামের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা ও মাসাইলের সাথে তিনি বহুক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থ 'আকীদায়ে ওয়াসিতিয়্যা'-এর মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি লিখেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেসকল মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোনো আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকো। কারণ ইতিহাসে যেসব রিওয়ায়াতে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত, যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোনো কোনো ব্যাপার রয়েছে যেগুলোতে কমবেশি করে মূল বিষয়ের উপর বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচিন নয়। বস্তুত ঘটনা বিশেষের ক্ষেত্রে যদি তাঁরা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ তাআলার আইন হলো-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ সৎ কাজের মাধ্যমে অসৎ কাজের কাফফারা হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কিরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ তাআলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সেজন্যই তাঁদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারোর নেই। (আকীদায়ে ওয়াসিতিয়্যা)

সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেওয়া কিংবা তাদের সমালোচনা করার কোনো অধিকার বা সুযোগ কাউকে দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে রাসূলে পাক ﷺ এর সুস্পষ্ট নিষেধ বাণী সহীহ হাদীসে পরিলক্ষিত হয়। যেমন হুজুরে পাক ﷺ ইরশাদ করেন,

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ، لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ. (رواه البخارى ومسلم والترمذى وابو داود)

-তোমরা আমার সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিও না। কেননা তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তবুও তাঁদের এক মুদ (এক সেরের চেয়ে কিছু কম) পরিমাণ কিংবা অর্ধ মুদ পরিমাণের সমানও হবে না। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

অন্যত্র রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন,

اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

-সাবধান! সাবধান! আমার সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না। যে তাদেরকে মহব্বত করবে আমার সঙ্গে মহব্বতের কারণে তাদেরকে মহব্বত করবে। আর যে তাদের সাথে শত্রুতা করবে, আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকার কারণেই তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে। আর যে তাঁদেরকে কষ্ট দিবে সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিবে সে আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিল। আর (জেনে রেখো) যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে, অচিরেই তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। (তিরমিযী)

অপর হাদীসে আছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ. (رواه الترمذى)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা এমন লোকদের দেখবে যারা আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলে, তখন তাদেরকে বল যে, তোমাদের মন্দ কাজের উপর আল্লাহর লানত। (তিরমিযী)

সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিদগ্ধ উলামায়ে কিরাম নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

**এক.** শ্রেষ্ঠ তাবিঈ হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম উম্মতের অগ্রবর্তী, অনুসরণীয় এবং তাঁরা সঠিক পথের ওপর ছিলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাত)

**দুই.** ইমাম হাসান বসরী (র.) কে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সংঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন, এটা এমন এক ব্যাপার যে, রাসূলের সাহাবীগণ তখন উপস্থিত ছিলেন, আর আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। তাঁরা ঘটনা ও পরিবেশের প্রকৃত স্বরূপ জানতেন অথচ আমরা তা জানি না। সুতরাং যে বিষয়ে তারা ঐকমত্য পোষণ করবেন, আমরা তা অনুসরণ করি এবং যে বিষয়ে ইখতিলাফ করেছেন, তাতে আমরা নীরবতা অবলম্বন করি। (কুরতুবী)

**তিন.** ইমাম মালিক (র.) সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনাকারীদের প্রসঙ্গে বলেন, এদের আসল উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু এটার সাহস না হওয়াতে সাহাবীগণকে মন্দ বলতে লাগল। যাতে করে (মাআযাল্লাহ) মানুষ মনে করে যে, স্বয়ং রাসূলই খারাপ লোক ছিলেন। যদি তিনি ভালো হতেন তাহলে তাঁর সাহাবীগণও ভালো হতেন। (আস সারিমুল মাসলুল লি ইবনি তাইমিয়া)

**চার.** ইমাম শাফিঈ (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, এটা এমন রক্তপাত যা থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন। কারণ তখন আমরা উপস্থিত ছিলাম না। তাই আমাদের জিহ্বাকেও তা থেকে পবিত্র রাখা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। (শরহে মাওয়াকিফ)

**পাঁচ.** অধিকাংশ হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হলো, ১. প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর সমালোচনাকারী হত্যার উপযুক্ত। তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কারো মতে তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। অন্যান্য সাহাবীদের সমালোচনাকারীদের ব্যাপারে বিচারক তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। (নিবরাস)



# লিবারেলিজমে ঢাকা পড়ছে ইসলামী পরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি

মারজান আহমদ চৌধুরী

আল্লামা ইকবাল তাঁর খুদী দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ সুরা হাশরের ১৯ নম্বর আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেছিলেন, যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরকে ভুলিয়ে দেন। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, তারা কি নিজেদের প্রতি খেয়াল রাখতে ভুলে যায়? আমরা তো দেখি তার উলটো। তাদের খাওয়া, ঘুম, আনন্দ-ফুর্তি সবই বহাল থাকে। তাহলে বুঝা যায়, খাওয়া, ঘুম, আনন্দ-ফুর্তির মাধ্যমে তারা যে দেহের চাহিদা পুর্ণ করছে, সে দেহ তাদের প্রকৃত 'আত্ম বা নিজ' নয়। বরং দেহের অভ্যন্তরে এমন একটি সত্ত্বা আছে, যে সত্ত্বা হচ্ছে মানুষের প্রকৃত 'আত্ম বা নিজ'।

মানবদেহের অভ্যন্তরীণ যে সত্তার কথা আল্লামা ইকবাল বলতে চেয়েছেন, সে সত্তাকে আমরা রূহ বলি। একজন মানুষ যখন নিজেকে 'মানুষ' বলে পরিচয় দিচ্ছে, তখন সে কেবল একটি দুপেয়ে প্রাণীর বর্ণনা দিচ্ছে না। সে এমন এক সৃষ্টির কথা বলছে, যার ভেতর একটি Conscience তথা সচেতন বোধ রয়েছে। এ বোধকে রূহানিয়াত বলা যায়। প্রাণ তো সব প্রাণীর মধ্যেই আছে। কিন্তু রূহ এমন একটি অমর সত্তা, যা সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আদমের ভেতর ফুঁকে দিয়েছেন। যদিও আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, তিনি আমাদেরকে রূপ সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান দিয়েছেন, তবুও আমরা এটুকু জানি যে, এই রূহ মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে। সুতরাং রূহ-ই মানুষের আসল পরিচয়। রূহ থাকার কারণে মানুষ এমন বহু কাজ করতে পারে না, বহু কিছু খেতে পারে না, যা অন্যান্য ইতর প্রাণীরা অনায়াসে করে বা খেয়ে ফেলে। রূহ থাকার কারণে মানুষ নিজের ভেতর কিছু দায়িত্ববোধ, কিছু সীমাবদ্ধতা, কিছু অধিকার এবং কিছু বিশেষ মর্যাদা অনুভব করে, যা অন্য কোনো প্রাণী অনুভব করতে পারে না। অপরদিকে মানুষ যখন তার রূহ বা রূহানী পরিচয়কে ভুলে যায়, তখন স্রষ্টার সাথে যখন সম্পর্কও টুটে যায় । ওই যে দায়িত্ববোধ, ওই যে সীমাবদ্ধতা, ওই যে সম্মান, তা নিমিষেই হারিয়ে যায়। মানুষ তখন কেবল এক প্রাণী হয়ে যায়। তখন মানুষের মুনাজাতের মিষ্টতা হারিয়ে যায়। অবাধ্য হওয়ার পর আবার কাতর হয়ে স্রষ্টার কাছে কাকুতি মিনতি করার প্রয়াস হারিয়ে যায় । আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার ওপর নিজের খায়েশ প্রাধান্য পেয়ে যায়। এক সময় সে শয়তানের হাতের পুতুল হয়ে যায়। এমন এমন কাজ সে করে, যা মনুষ্যত্বের অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। রূহ বা রূহানিয়াতকে যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স ও সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ধারণা খুব একটা ভুল নয়। কারণ এসব নাস্তিক দার্শনিকরা মানুষকে কেবল প্রাণী ভেবেই তাদের থিওরি প্রণয়ন করেছেন।

এবার আসি রূহানী পরিচয়ের উৎকর্ষ, তথা মুসলিম পরিচয় প্রসঙ্গে। একজন মানুষ যখন নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তখন সে কেবল একটি ধর্মবিশ্বাসের কথা বলছে না। বরং সে তার নিজের পরিচয়, তার জীবনদর্শন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির (Worldview) কথা জানান দিচ্ছে। ইসলাম তার জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচয় ও জীবনদর্শন নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিছু আখলাকি সীমাবদ্ধতা, কিছু নৈতিক দায়দায়িত্ব, কিছু আইনি আবশ্যকতা এবং অপরিসীম মর্যাদার মিশেলে গড়া উঠা সে পরিচয় নিয়েই একজন মুসলিম পুরো বিশ্বকে দেখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুমিন ও ঈমানের উদাহরণ হচ্ছে একটি ঘোড়ার ন্যায়, যাকে খুটির সাথে বেধে রাখা হয়েছে। সে চতুর্দিকে ঘুরেফিরে আবার খুটির কাছে চলে আসে। মুমিন ব্যক্তি ভুল করে, কিন্তু আবার ফিরে আসে ঈমানের দিকে" (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১৩৩৫)। একজন মুসলমানের পরিচয়, দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা বুঝার জন্য এ হাদীসটি যথেষ্ট। একইসাথে ইসলাম তার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করেছে, যা দিয়ে সে দুনিয়া দেখে, সবকিছু বিচার করে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ছাচে ফেলে সে দুনিয়ার সবকিছুকে বিচার-বিবেচনা করে, সিদ্ধান্তে পৌঁছে। ইসলামের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে, আবার পশ্চিমা লিবারেলিজমের আরেকটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে। একজন মুসলমান ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে দুনিয়া দেখে। এটি একজন মুসলমানের জন্য তার পরিচয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা একটি শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়, অথবা একজন অমুসলিম যখন ইসলাম কবূল করে, তখন তার অন্যান্য পরিচয়ের সাথে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম পরিচয় তৈরি হয়। যদি অন্যান্য পরিচয়– যেমন দেশ, জাতি, ভাষা, গোত্র ইত্যাদি তার কাছে ইসলামের দেয়া পরিচয় থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলে নামে মুসলিম হলেও ওই ব্যক্তির অনুভূতির মধ্যে ইসলাম কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইসলামের দেওয়া পরিচয়টি যদি তার কাছে অন্য পরিচয়ের চেয়ে শক্তিশালী হয়, তাহলে ওই পরিচয়ই তার চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির পেছনে মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক । এক বিবাহিত দম্পতির মধ্যে ঝগড়া লেগে মামলা বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত চলে গেছে। তাদের এ প্রক্রিয়ায় দশজন মানুষ জড়িত ছিল, যারা খুব কাছ থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে।

এবার দশজন প্রত্যক্ষদর্শী যদি ওই দম্পতির বিবাহ, ঝগড়া এবং বিচ্ছেদকে বর্ণনা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করবে। বর্ণনার সময় মূল ঘটনা বহাল থাকুক কিংবা না থাকুক, বর্ণনাকারীর নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব বর্ণনার মধ্যে চলে আসবে। বর্ণনার এই পক্ষপাতিত্ব গড়ে ওঠে বিচারের ভিন্নতা থেকে, বিচারের ভিন্নতা ঘটে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ঘটে পরিচয়ের ভিন্নতার কারণে। ব্যক্তি তার নিজের জন্য কী পরিচয় নির্ধারণ করেছে, তার ওপর নির্ভর করে, সে একটি ঘটনাকে কিভাবে দেখে করে, কিভাবে বিচার করে এবং কিভাবে ব্যাখ্যা করে।

আজকের আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে পরিচয়হীনতার ফিতনা। মানুষ নিজের মানবিক পরিচয় ভুলে যাচ্ছে। যেখানে মানবিক পরিচয়-ই থাকছে না, সেখানে মুসলিম পরিচয় থাকার তো কথাই নেই। মানবজাতির বড় একটি অংশ আজ এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, যে অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য ইবলীস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। কুরআন শরীফে এসেছে-

لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

-আল্লাহ তাকে (ইবলীসকে) লা'নত করেছেন এবং সে বলেছে, অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব। অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। (সূরা নিসা, আয়াত ১১৮-১১৯)

মানবিক পরিচয়হীনতার নিকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পশ্চিমা বিশ্বে দেখতে পাই। পশ্চিমা বিশ্বের ফিতনাসমূহের কথা বললে প্রথমেই আসে লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার এবং নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করা বর্তমানে প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্রের নীতিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু সে স্বাধীনতা যখন লাগামহীন হয়ে পড়ে, তখনই এর অবশ্যম্ভাবী কুফল দেখা যায়। লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা পশ্চিমা সমাজের নৈতিক দেউলিয়াত্বের একটি অবশ্যম্ভাবী উপজাত Inevitable byproduct of moral bankruptcy), যা আজ মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের মুসলিম সমাজে প্রবেশ করছে। পশ্চিমা বিশ্ব আজ যে পর্যায়ে চলে গেছে, এক সময় এ পর্যায়ে ছিল না। পারিবারিক-সামাজিক জীবনে কিছুটা মূল্যবোধ তাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু যা ছিল না, তা হচ্ছে আসমানী হিদায়াত। ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের সীমাহীন দুর্নীতি এবং এর ফলশ্রুতিতে চার্চের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের পর ধর্মীয় নৈতিকতা ও বিধিবিধানের প্রতি পশ্চিমাদের মন এতটাই বিষিয়ে উঠেছে যে, আজ তারা ধর্মীয় বিধিবিধানের নামও মুখে আনতে চায় না। ধর্মীয় বিধিবিধানকে আল বিদা বললেও সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তন পশ্চিমা দুনিয়ায় বহাল ছিল এবং আজও আছে। ইউরোপের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন Renaissance এবং ধর্মীয় আন্দোলন Reformation এর পর পশ্চিমা সমাজ বিবর্তিত হয়ে আধুনিকতার দিকে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমাহীন উৎকর্ষে পৌঁছেছে। কিন্তু ওসব সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনকে পথ দেখানোর মতো কোনো আসমানী হিদায়াত যেহেতু তাদের হাতে ছিল না, তাই জাগতিকভাবে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছালেও নৈতিকভাবে তারা অবনতির তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যাবতীয় নীতিনৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে দিতে আজ পশ্চিমা দুনিয়া এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে রূহ এবং রূহানিয়াতের নামগন্ধও নেই। বলা যায়, নৈতিকভাবে এদের মৃত্যু ঘটেছে। তারা টিকে আছে কেবল প্রযুক্তির জোরের ওপর। আর নৈতিক মৃত্যুর চাক্ষুষ ফলাফল হচ্ছে লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা। আজ পশ্চিমাদের স্লোগান হলো, My body my choice বা 'আমার দেহ আমার ইচ্ছা'। অন্যকে বিরক্ত করা পশ্চিমা বিশ্বে অপরাধ, কিন্তু নিজের দেহের সাথে যা ইচ্ছা করা যায়। যেন এ দেহের ওপর সৃষ্টিকর্তার কোনো হকই নেই। অবাধ যৌনতা, সমকামিতা, উভকামিতা ইত্যাদি পশ্চিমা বিশ্বে খুব স্বাভাবিক বিষয়। বিবাহকে এখানে উটকো ঝামেলা মনে করা হয়। ২০২১ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ৪৮ শতাংশ আমেরিকান তরুণ-তরুণী বিবাহকে গুরুত্বহীন মনে করে। যখন চিন্তাই হচ্ছে 'আমার দেহ আমার ইচ্ছা', তখন দেহকে খুশি করার জন্য বিবাহ নামক আইনি বন্ধনে কে আবদ্ধ হতে চাইবে? বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, Yale University এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৬ সালে সারাবিশ্বে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের মধ্যে ১৫ শতাংশ তথা ২১ মিলিয়ন শিশু ছিল বিবাহবহির্ভূত সন্তান। যখন ব্যক্তির পছন্দই এখানে শেষ কথা, তখন পুরুষ নারীর সাথে সম্পর্কে জড়াচ্ছে, নাকি অন্য আরেক পুরুষের সাথে– সেটি দেখার সময় কোথায়? The Guardian ও Statista এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকা ও জার্মানিতে সমকামীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশের ওপরে। আজ বলা হচ্ছে, Sexuality is not about who you are, but it is about whom you love. এর মর্মার্থ দাঁড়ায়, যৌনতা কেবল বিপরীত লিঙ্গের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তুমি যার সাথে ইচ্ছা তার সাথেই সেটি সম্পন্ন করতে পারো।

এরচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে লিঙ্গ পরিবর্তনের ফিতনা। সৃষ্টিকর্তা আমাদের Biological gender তথা জন্মগত লিঙ্গের সাথে আমাদের Gender identity তথা লৈঙ্গিক পরিচয়, Gender expression তথা লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি এবং Sexual orientation তথা যৌন অভিযোজনকে এক নির্দিষ্ট সুত্রে বেধে দিয়েছেন। যে জন্মগতভাবে পুরুষলিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে, তার লৈঙ্গিক পরিচয় হবে পুরুষ, তার লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি হবে পুরুষের মতো এবং তার যৌন অভিযোজন হবে বিপরীতলিঙ্গ তথা নারীর দিকে। আবার যে জন্মগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে, তার লৈঙ্গিক পরিচয় হবে নারী, তার লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি হবে নারীর মতো এবং তার যৌন অভিযোজন হবে বিপরীতলিঙ্গ তথা পুরুষের দিকে। আজ এ সুত্রকে ছিড়ে আলাদা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমার জন্মগতভাবে প্রাপ্ত লিঙ্গ-ই তোমার লৈঙ্গিক পরিচয় নয়। কিংবা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত লিঙ্গ বহাল রাখতে তুমি বাধ্য নও। তুমি চাইলে পুরুষ এবং চাইলে নারী হতে পারো। তোমার লিঙ্গ নির্ভর করে তোমার লৈঙ্গিক অভিব্যক্তির বা পছন্দের ওপর। এটি শুধু কথায় নয় বরং পৃথিবীতে আজ লিঙ্গ এবং লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি পরিবর্তনের বন্যা বইছে। হোক সেটি বিপরীত লিঙ্গের বেশভূষা ধারণ করার মাধ্যমে, কিংবা অপারেশন করে লিঙ্গ পরিবর্তন করার মাধ্যমে । পছন্দই এখানে শেষ কথা, চাই সে পছন্দ যতই অমানবিক হোক। চাই সেটি রাতে এক রকম, দিনে আরেক রকম হোক। মনে হচ্ছে আজ ইবলীসের চ্যালেঞ্জ পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

আরেকটি ফিতনা হচ্ছে ভার্চুয়াল জগতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি। নিজের অস্তিত্ববান আশপাশকে ভুলে এক মিছেমিছি জগতের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে নেয়া। যেহেতু অস্তিত্ববান জীবনে দুঃখ কষ্ট আসে, জয়-পরাজয় উভয়ের সম্ভাবনা থাকে, তাই আজ সবাই এ জগত ছেড়ে নিজের জন্য একটি মিথ্যা জগত তৈরি করতেই সাচ্ছন্দ্যবোধ করে। Facebook, Youtube, Tweeter, Instagram এর মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং গেইমিং ইন্ডাস্ট্রি আজ লোকদের ভার্চুয়াল আসক্তিকে পুরন করে চলছে। আমরাও নিজেরাও এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত নই। Finance Online এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভিডিও গেইমে আসক্ত ব্যক্তিরা সপ্তাহে ৮০-১০০ ঘন্টা পর্যন্ত সময় ভিডিও গেইম খেলে কাটিয়ে দেয়। ভার্চুয়াল জগতে আসক্তদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ মানুষের পারিবারিক সম্পর্কের ওপর এই আসক্তির খারাপ প্রভাব পড়ে এবং ৭০ শতাংশ মানুষ ধীরে ধীরে অন্যান্য আসক্তি তথা মাদকের দিকে পা বাড়ায়।

নীতিহীন, পরিবারহীন, লাগামহীন জীবন এবং

সেই জীবনের বড় একটি অংশ ভার্চুয়াল জগতে কাটিয়ে দেওয়ার পর অবশ্যম্ভাবী আরেকটি ফিতনা আসে, যার নাম Depression বা হতাশা। WHO এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে পৃথিবীতে হতাশায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ২৮০ মিলিয়ন। এটি হওয়ারই কথা। যেহেতু মানবিক পরিচয় হারিয়ে পশুর মতো দেহের চাহিদা মিটিয়ে জীবন পার হয়েছে, যেহেতু সুখ-দুঃখ বলার জন্য পরিবার বলে কিছু বাকি নেই, জীবনে বড় কোনো লক্ষ্য নেই, রূহের কোনো দখলদারি নেই, স্রষ্টার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, অতএব মনে শান্তি আসবে কোথা থেকে? দেহের চাহিদা কিছুদিন পর মিটে যায়। টাকা কামানোর পর কামানোর স্পৃহায় ভাটা পড়ে। হৈ-হুল্লোড়, আনন্দ-ফুর্তি এক সময় একঘেয়ে হয়ে যায়। এরপর আসে প্রশ্ন, আফসোস, রোগবালাই, বিরক্তি, হতাশা। স্বাভাবিকভাবেই, অন্যকে দেওয়ার আনন্দ নিজে ভোগ করার আনন্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি স্থায়ী। যে সভ্যতা কেবল ভোগ করতে শেখায়, সে সভ্যতার কাছে মানবিক জিজ্ঞাসার জবাব থাকে না। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে হতাশা, মদ্যপান ও আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, আমেরিকা, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স, ইন্ডিয়া প্রমুখ দেশগুলো আত্মহত্যার পরিসংখ্যানে আফ্রিকার বহু গরীব দেশের চেয়ে এগিয়ে।

এসব ফিতনা একজন মুসলমানকে ইসলামের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে পশ্চিমা লিবারেলিজমের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূলনীতির মধ্যে শেষ দুটি আগে থেকেই দুষমনদের হামলার শিকার ছিল। শরীআতের বিধান অনুযায়ী খিলাফাত ব্যবস্থার পরিবর্তে সেক্যুলার গণতন্ত্র এবং 'এক উম্মাহ' তত্ত্বের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত করার মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক সত্তাকে এক শতাব্দী আগেই বিলীন করা হয়েছে। বণ্টনের অর্থনীতির পরিবর্তে কুঞ্চনের অর্থনীতিতে ফাসিয়ে মুসলমানদেরকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের দাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। ন্যায্য ও সুসম প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবর্তে লাগামহীন পুঁজিবাদ ও ফটকাবাজারের অতল গহ্বরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এতে দুষমনের ষড়যন্ত্র যেমন আছে, নিজেদের নাদানিও তেমন আছে। তথাপি মুসলমানদের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের মূলনীতি ও মূল্যবোধ এখনও কিছুটা বাকি ছিল। আজ এটিও ফিতনার সম্মুখীন। আজ সবচেয়ে বেশি আঘাত করা হচ্ছে মুসলমানদের পারিবারিক-সামাজিক মূলনীতি ও মূল্যবোধে। পরিচয়ের সংকটে থাকা এ উম্মাহ আধুনিকতার চকচকে মোড়কে পেছানো এসব ফিতনা অবচেতনভাবেই গিলে খাচ্ছে। লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী-পুরুষের পুরোপুরি সমতা, প্রকাশ্য অশ্লীলতা, মাদক, ভার্চুয়াল জগতে আসক্তি আজ আর অপারের খবর নয়। আমাদের সমাজেও আজ নানাভাবে এগুলো ঢুকে পড়েছে। এসব ফিতনা যে কেবল পাপের মাত্রা বাড়াচ্ছে, তা নয়। বরং মুসলমানদেরকে পশ্চিমা ভোগবাদী-ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনদর্শন ও যৌন-অনাচারপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্ত করে খোস ইসলামকে, ইসলামের নীতিনৈতিকতাকে, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনিত জীবনদর্শনকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করছে। কেবল পশ্চিমা লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে বহু প্রাক্টিসিং মুসলমান রাসূল ﷺ এর পাক-পবিত্র আখলাক ও জীবনের ওপর প্রশ্ন তুলে বসে, যা আমি নিজের কানে শুনেছি। এটি একটি ভয়ংকর ফিতনা, যা বিশ্বায়নের কারণে আজ আমাদের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই আজ প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের শিশুদের প্রতি নজর দেওয়া এবং ছোটকালেই তাদের মনে-মগজে ইসলামকে একটি দ্বীন, একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একইভাবে আমাদের উচিত দ্বীনি দাওয়াত ও দ্বীন শিক্ষায় যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার মতো বিষয়কে সামনে আনা এবং এর প্রতিকারে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।


মাদরাসা-ই দারুল মোস্তফা
MADRASAH-E-DARUL MUSTAFA
আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

● আবাসিক
অনাবাসিক ●
● ডে-কেয়ার

নাজেরা ও নূরানী বিভাগ
হিফজুল কুরআন বিভাগ
হিফজ রিভিশন বিভাগ

ভর্তি চলছে

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
তাজবিদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা।
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক।
নৈতিক মানোন্নয়নে নিয়মিত আখলাক্বী তা'লিম ও তরবিয়ত প্রদান।
পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা।
রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা।

সিসি টিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রয়োজনে
হাফিজ ফয়েজ আহমদ
প্রিন্সিপাল
০১৭১৬-৮০৫৪৪৭
০১৭৯৮-৫৬১৫২১ (অফিস)

বাসা-৫৯, ব্লক-এ (মেইন রোড), শাহ্‌জালাল উপশহর, সিলেট

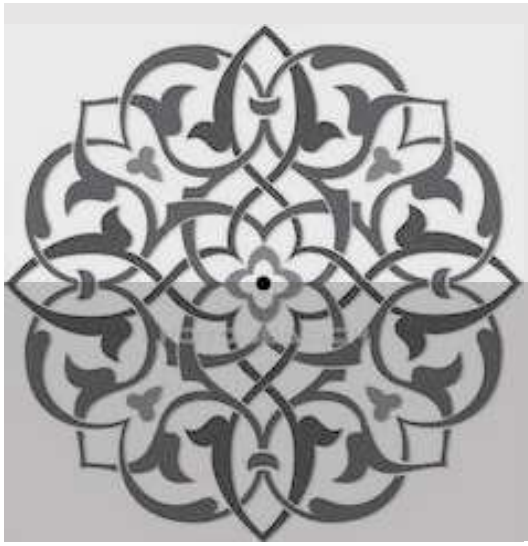

# আহলুল বাইত
# পরিচিতি ও মর্যাদা

এম. জুয়েল আহমদ লতিফি

আহলুল বাইতের অন্যতম সদস্য হলেন ইমাম হুসাইন (রা.)। অন্যায়ের প্রতিবাদে, দ্বীন প্রতিষ্ঠায়, ইনসাফ কায়িমে ইমামুশ শুহাদা হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যসহ পবিত্র মুহাররাম মাসে শাহাদাতবরণ করেছেন। তাই সে সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বছরের প্রতিটি মাসে বিশেষ করে মুহাররাম মাসে, আমাদের কলম লিখুক আহলুল বাইতের আলোচনা, আমাদের জবানে চলুক আহলুল বাইতের মর্যাদার বয়ান, আমাদের আমল হোক আহলুল বাইতের নমুনায়, আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্তরে ছড়িয়ে পড়ুক আহলুল বাইতের মুহাব্বাত। এরই অংশ হিসেবে আজকের প্রবন্ধ "আহলুল বাইত : পরিচিতি ও মর্যাদা।"

### আহলুল বাইত এর পরিচিতি

"আহলুল বাইত" এই মুরাক্কাব শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, ঘরের সদস্যগণ, পরিবারবর্গ। কিন্তু ইসলামে আহলুল বাইত বলতে কাদের বুঝানো হয়? তা স্পষ্ট করতে কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের আলোকে এখানে চারটি মত তুলে ধরা হলো।

**০১। আহলুল বাইত হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণ। দলীল:**

قوله تعالى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب – ٣٣)

وفي المراد بأهل البيت ها هنا ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لأنهنَّ في بيته،

رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة، وابن السّائب، ومقاتل. (زاد المسير)

**০২। আহলুল বাইত হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, আলী (রা.), ফাতিমা (রা.), হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.)। দলীল:**

قوله تعالى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب – ٣٣)

وفي المراد بأهل البيت ها هنا ثلاثة أقوال : .... والثاني: أنه خاصٌّ في رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم، قاله أبو سعيد الخدري. (زاد المسير)

**০৩। আহলুল বাইত হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণ ও তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীগণ। দলীল:**

قوله تعالى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب – ٣٣)

وفي المراد بأهل البيت ها هنا ثلاثة أقوال: .... والثالث: أنهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأزواجه، قاله الضحاك. (زاد المسير)

**০৪। আহলুল বাইত হলেন বনূ হাশিম তথা আলী (রা.) এর পরিবার, আকিল (রা.) এর পরিবার, জাফর (রা.) এর পরিবার এবং আব্বাস (রা.) এর পরিবার-এর সদস্যরা। দলীল:**

قوله تعالى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب – ٣٣)

وَقَالَ الثَّعْلَبِيُّ : هُمْ بَنُو هَاشِمٍ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْتَ يُرَادُ بِهِ بَيْتُ النَّسَبِ، فَيَكُونُ الْعَبَّاسُ وَأَعْمَامُهُ وَبَنُو أَعْمَامِهِ مِنْهُمْ.

وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (تفسير القرطبي)

فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، (رواه مسلم، ح/٢٤٠٨)

### আহলুল বাইতের মর্যাদা

**০১। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মুহাব্বাতের দাবি**

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াতী কাজের জন্য কোনো বিনিময় উম্মতের কাছে কখনো চাননি। তবে একটি দাবি তিনি উম্মতের কাছে রেখে গেছেন, তা হলো "আহলুল বাইতকে মুহাব্বাত করার দাবি"। আর সেটাও আল্লাহ তাআলার নির্দেশে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি বলুন, আমি এর জন্য (তথা দ্বীনি দাওয়াতের কাজের বিনিময়ে) কোনো পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু (আমি চাই) নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা। (সূরা শুরা, আয়াত-২৩)

আর এই নিকটাত্মীয়রাই হলেন আহলুল বাইত। দলীল:

ثم في المراد بقرابته قولان:

أحدهما: عليّ وفاطمة وولدها، وقد رووه مرفوعاً إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

والثاني: أنهم الذين تَحْرُم عليهم الصدقة ويُقْسَم فيهم الخُمُس وهم بنو هاشم وبنو المطّلب. (زاد المسير)

**০২। অপবিত্রতা দূরীকরণ ও পবিত্রতার ঘোষণা**

আল্লাহ তাআলা আহলুল বাইত থেকে অপবিত্রতা দূরীকরণ ও পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন। এই জন্য উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম "আযওয়াজে মুতাহহারাহ" শব্দ বলে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

عَلَيْكُمْ؟ قَالَ (رسول الله صلى الله عليه وسلم): "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" (رواه البخاري، ح/٣٣٧٠)

অর্থাৎ কা'ব ইবন উজরা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কিভাবে দুরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম প্রদান করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

প্রিয় পাঠক! সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করতে চাই ইমাম শাফিঈ (র.) এর রচিত কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে,

يا آل بيت رسولِ الله حبكم * فرضٌ من الله في القرآن أنزله

يكفيكم مِن عظيم الفخر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له

إن كان "رفضا" حبُّ آل محمد * فليشهد الثقلان أني رافضي

(ديوان الإمام الشافعي، ج/١، ص/٢١، جامع الكتب الإسلامية)

অর্থাৎ হে আহলুল বাইতি রাসূলিল্লাহ ﷺ! আল্লাহর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে আপনাদের প্রতি মুহাব্বাতকে ফরয করা হয়েছে, আপনাদের সুমহান মর্যাদা প্রমাণে তো এটাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি নামাযে আপনাদের প্রতি সালাত (দুরূদ) পাঠ করবে না তার নামাযই হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলুল বাইতের মুহাব্বাতই যদি হয় রাফিযী হওয়ার একমাত্র কারণ, তাহলে জিন-ইনসান সকলেই যেন সাক্ষ্য দেয় (তারা যেন জেনে রাখে) আমি রাফিযী।

**০৪। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্কবাণী**

উপর্যুক্ত মুসলিম শরীফের হাদীসটির শেষাংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুল বাইতের মর্যাদার প্রতি বিশেষ নযর রাখার জন্য উম্মতকে তিন তিন বার সতর্ক করে গেছেন। দলীল:

أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي (رواه مسلم، ح/٢٤٠٨)

অর্থাৎ আর আমি আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

**০৫। নূহ (আ.) এর নৌকার সাথে আহলে বাইতের তুলনা**

আমরা জানি নূহ (আ.) এর সময়ে যখন মহাপ্লাবন এসেছিল, তখন শুধুমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছিল যারা ঈমান এনে নূহ (আ.) এর নৌকায় আরোহন করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুল বাইতকে সেই রক্ষাকারী নৌকার সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ যুগে যুগে যখনই ফিতনার তুফান আসবে তখন যারা সেই সকল ফিতনা থেকে বাঁচতে চায় তারা যেন আহলুল বাইতের নৌকায় চড়ে, মানে তাঁদের অনুসরণ করে। দলীল- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ" (المستدرك للحاكم، ح/٣٣١٢)

অর্থাৎ আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত হলো নূহ (আ.) এর নৌকার ন্যায়। যারা তাতে আরোহণ করবে তারা মুক্তি পাবে, আর যারা পিছিয়ে থাকবে, তারা ডুবে যাবে (ধ্বংস হয়ে যাবে)।

**০৬। নামায আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো আহলুল বাইতের প্রতি দুরূদ পড়া**

আহলুল বাইতের সুমহান মর্যাদা প্রমাণ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যারাই নামায পড়বে তারা আহলুল বাইতের প্রতি দুরূদ পড়তে হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্যাদা কী পরিমাণ উর্ধ্বে রেখেছেন, তা এখান থেকে সহজেই অনুমেয়। দলীল:

كَعْبُ بْنُ عُجْرَة فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب– ٣٣)

অর্থাৎ হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ তো এটাই চান যে, তিনি তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে পরিচ্ছন্ন করে দিবেন। (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩)

**০৩। উম্মতের জন্য রেখে যাওয়া দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো "আহলুল বাইত"**

বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য জীবন চলার দিক নির্দেশনা হিসেবে দুইটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু অপর আরেকটি ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের জীবন চলার দিকনির্দেশনা হিসেবে আবারো দু'টি বিষয়কে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো কুরআন ও আহলুল বাইত। দুই হাদীসের মধ্যে তাতবীক করলে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর বাস্তব চিত্র হলো আহলুল বাইত। দলীল:

عن زيد بن أرقم قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، (رواه مسلم، ح/٢٤٠٨)

অর্থাৎ হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি 'খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। অতঃপর বললেন, হুঁশিয়ার, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্তরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর আহবানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বাইত।

# বাইতুল্লাহ নির্মাণের ইতিহাস

মূল: মাহমুদ মুহাম্মদ
অনুবাদ: মুহাম্মদ যাহিন



**হাজরে আসওয়াদ**

হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর হচ্ছে কাবা শরীফের পূর্বকোণে স্থাপিত একটি জান্নাতী পাথর। কোন কোন বর্ণনা মতে, আদম (আ.) এর সময়ে এ পাথরটি বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আনীত হয়, আবার কারো কারো মতে, জিবরাঈল (আ.) এটি ইবরাহীম (আ.)কে প্রদান করেন। সর্বোপরি, বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীস শরীফের আলোকে জানা যায়, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আনয়নের সময় এটি ছিল দুধের চেয়েও সাদা, পরবর্তীতে আদম সন্তানের গুনাহের কারণে এটি কালো রঙে পরিণত হয়। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাসিক ৩/২৯২। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান)

বর্তমানে এই পাথরটি মাতাফ থেকে ১.১০ মিটার উপরে রূপার কাঠামো স্থাপিত আছে। সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) এই পাথরটিকে রূপার কাঠামো স্থাপন করেন। হাজরে আসওয়াদ ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক প্রথম স্থাপিত হয়, পরবর্তীতে কুরাইশদের পুনঃনির্মাণের সময় রাসূল ﷺ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এটি মূলত একটি পাথর হলেও কালের আবর্তনে ভেঙ্গে কয়েক টুকরোতে পরিণত হয়। বিশেষত কারামাতিরা এই পাথরটিকে কাবা প্রাঙ্গন থেকে অপসারণ করে ২২ বছর কাবা থেকে সরিয়ে রাখে। পরবর্তীতে ৩৩৯ সালে এর ভাঙা টুকরোসমূহকে একত্রিত করে কাবা প্রাঙ্গনে আগের মতো আবার স্থাপন করা হয়।

পবিত্র পাথর হাজরে আসওয়াদকে রাসূল ﷺ এবং তাঁর পূর্বের সকল নবীগণ চুম্বন করেছেন। এজন্যই তাওয়াফকারীদের জন্য সুন্নাত যে, তারাও এটিকে চুম্বন করবে অথবা ভিড়ের সময় তার ইসতিলাম করবে (অর্থাৎ, হাত অথবা লাঠি দ্বারা তার দিকে ইশারা করে চুম্বন করবে)। যদি এটি করতেও তারা অপারগ হয়, তাহলে স্রেফ ইশারা করে তাকবীর বলে তাওয়াফ করবে।

এই বরকতময় পাথরের মর্যাদার কথা অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে কয়েকটি হাদীস আমরা এখানে তুলে ধরছি-

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি হুযুর ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রুকন (রুকনে ইয়ামানী) জান্নাতের ইয়াকুতের মধ্য থেকে দুটি ইয়াকুত। আল্লাহ তাআলা এগুলোর জ্যোতিকে নষ্ট করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ তাআলা এগুলোর জ্যোতিকে নষ্ট না করতেন, তাহলে এ দুটি পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী সবকিছুকে জ্যোতির্ময় করে দিতো। (তিরমিযী, কিতাবুল হাজ্জ)

২. হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, হুযুর ﷺ হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে ওঠাবেন যে, তখন তার দুটি চোখ থাকবে, এগুলোর মাধ্যমে সে দেখতে পাবে। তার মুখ থাকবে; যার দ্বারা সে কথা বলতে পারবে এবং তার ঈমান সাক্ষী দেবে। যে ঈমানের সাথে তার ইসতিলাম করবে। (তিরমিযী, কিতাবুল হাজ্জ)

৩. হযরত ইবন উমর (রা.) বলেন, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে এ দুটো (অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী) স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারা। (তিরমিযী, কিতাবুল হাজ্জ; বাবু মা জাআ ফী ইসতিলামির রুকনাইনি)

**রুকনে ইয়ামানী**

এটি কাবাঘরের দক্ষিণ পাশের অংশ। এটি ইবরাহীম (আ.) এর মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য হুযুর ﷺ এটির ইসতিলাম করতেন। যেমনটা ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমি হুযুর ﷺ-কে শুধু বাইতুল্লাহর দুটি রুকনের ইসতিলাম করতে দেখেছি। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর। (বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ)

এই রুকন দুটির ইসতিলামের ফদীলত হলো, এর মাধ্যমে বান্দার পাপ মোচন হয়। হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার মাধ্যমে বান্দার পাপসমূহ মোচন হয়। (তাবারানী ও আহমদ)

**মুলতাযাম**

কাবার ফটক থেকে নিয়ে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত জায়গাটিকে মুলতাযাম বলা হয়। এই স্থানে অপেক্ষা করা সুন্নাত। হাজীগণ এখানে এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে সীনা, দুই হাত এবং চেহারা কাবামুখী থাকবে। এর প্রশস্ততা আনুমানিক দুই মিটার। একে মুলতাযাম বলার কারণ রাসূল যখন তাওয়াফ থেকে অবসর হতেন, তখন এখানে এসে অপেক্ষা করতেন। তাঁর বুক, দুই হাতসহ মুলতাযামের দিকে মুখ করে অপেক্ষা করতেন। (ইবন মাজাহ, বাবুল মুলতাযাম ২/৯৮৭, হাদীস-২৯৬২)

মুলতাযাম দুআ কবুলের বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে

যে, তিনি এইখানে অপেক্ষা করতেন এবং বলতেন- রুকন এবং দরজার মধ্যখানের জায়গাটিকে মুলতাযাম বলা হয়। যে-ব্যক্তি এই স্থানে অপেক্ষা করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবে, নিঃসন্দেহে তার দুআ কবূল হবে। (বাইহাকী, ৫/১৬৪)

**মিজাব**

এটি কাবাঘরের ছাদের উত্তর দিকে, অর্থাৎ হাতিমের পাশে অবস্থিত। কাবা শরীফের ছাদ ধোয়ার পানি এবং বৃষ্টির পানি বের হওয়ার জন্য এটি স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূল e এর যুহুরে নবুওতের পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশরা কাবা ঘর নির্মাণকালে এটি স্থাপন করা হয়েছিল। তখন সেটি ছিল কাঠের তৈরি। এরপর উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের যুগে ৯৯ হিজরীতে মক্কার গভর্নর খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসরী এই মিজাবকে স্বর্ণ দ্বারা তৈরি করেন এবং স্থাপন করেন। এরপর ১২৭৩ হিজরীতে উসমানী সুলতান আবদুল মাজিদ খান খাঁটি স্বর্ণে নির্মিত একটি মিজাব কাবার জন্য প্রেরণ করেন। সেটি ১৪১৭ হিজরী পর্যন্ত কাবাঘরে স্থাপিত ছিল। অতঃপর ১৪১৭ হিজরীতে সাউদী বাদশা ফাহাদ বিন আবদুল আযীয সেটি সরিয়ে অন্য একটি মিজাব প্রতিস্থাপন করেন। এটিও নিরেট সোনার তৈরি। এটির উচ্চতা আনুমানিক ২ ফুট।

**শাজরওয়ান**

কাবাঘরের তিনদিকের যমীনের সাথে মিলিত ধবধবে ঢালু যে স্তরটি রয়েছে, সেটি হচ্ছে শাজরওয়ান। হাতিমের দিকে এই ধবধবে ঢালু যমীনের সাথে মিলিত স্তরটি নেই। বরং হাতিমের দিকে কাবাঘরের যে সামান্য জায়গাটুকু রয়েছে, সেটি মূল কাবা ঘরেরই অংশ, যা অর্থাভাবে কুরাইশরা বাইরে রেখেছিল। শাজরওয়ানের উচ্চতা মাতাফ থেকে আনুমানিক ৬৮-৭৭ সেন্টিমিটার। শাজরওয়ানের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে, শাজরওয়ান কাবার ওই দেয়ালের অংশ, যেই অংশ ইবরাহীম (আ.) এর ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর কুরাইশরা কাবাকে সংক্ষিপ্ত করে দেয় এবং এই শাজরওয়ানের জায়গা বাহিরেই থেকে যায়। এজন্য অনেক ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন যে, যদি শাজরওয়ান থেকে তাওয়াফ করা হয়, তাহলে তাওয়াফ সঠিক হবে না, কেননা শাজরওয়ান মূল কাবারই অংশ।

শাজরওয়ানের ব্যাপারে দ্বিতীয় বর্ণনা এই, কাবাঘরের দেয়াল যাতে মজবুত হয়, সেজন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) এই শাজরওয়ান বানিয়েছিলেন। যাতে পানি কাবার দেয়ালে ছড়িয়ে পড়তে না পারে; তাওয়াফকারীরা যাতে কাবার পর্দার সাথে লেপ্টে তাওয়াফ না করতে পারে এবং ভিড়ের সময় যাতে লোকদের শরীর কাবার দেয়াল থেকে দূরে থাকে। শাজরওয়ানের ভেতর এমন লোহার কড়া বসানো হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কাবার গিলাফের রশি বাঁধা হয়।

**কাবার গিলাফ**

পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালের সাথে ঝোলানো পর্দাকে কিসওয়া বা গিলাফ বলা হয়। কাবা ঘরের বাইরে এবং ভিতরে একটি করে মোট দু'টি গিলাফ রয়েছে। কাবার বাইরের গিলাফ সর্বপ্রথম হযরত ইসমাইল (আ.) ঝুলিয়েছিলেন। অপর বর্ণনা মতে, সর্বপ্রথম গিলাফ ইয়ামানের বাদশা তুব্বা হিমইয়ারী ঝুলিয়েছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ইয়ামানী কাপড়ের তৈরি গিলাফ দ্বারা কাবাকে সজ্জিত করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরও খলীফা, আমীর এবং অন্যান্য বাদশাহগণ সেই আমল জারি রাখেন এবং সর্বদা কাবাকে গিলাফ দ্বারা আবৃত করে রাখেন।

প্রথম প্রথম কাবাঘরে গিলাফ চড়ানোর রীতিটা এমন ছিল যে, নতুন তৈরি গিলাফকে আগেরটার উপরই ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আব্বাসী খলীফা মাহদী যখন ১৬০ হিজরীতে হজ্জ পালন করতে আসেন, তখন কাবাঘরের খাদিমগণ খলীফাকে এই বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। খলীফা তখন এই নির্দেশ জারি করেন যে, আগামী থেকে কাবাঘরে শুধু একটি গিলাফই ঝুলবে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই ধারাই চলমান আছে।

উমাইয়া এবং আব্বাসী খিলাফতকালে এই ধারা চলমান ছিল যে, কাবার গিলাফ খিলাফতের রাজধানী থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতো। কিন্তু আব্বাসী খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়লে মিশর অথবা ইয়ামান থেকে এই পর্দা তৈরি হয়ে আসতো। তারপর যখন উসমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলো, তখন থেকে এই গিলাফ উসমানীদের রাজধানী থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতে থাকে। পরবর্তীতে তুর্কিদের উসমানী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তুর্কি খিলাফতের পক্ষ থেকে গিলাফ তৈরির দায়িত্ব মিশরের মুহাম্মদ আলী পাশার হাতে ন্যস্ত করা হয়। এরপর প্রতি বছর মিশর থেকে কাবাঘরের গিলাফ প্রস্তুত হয়ে আসতে থাকে। এরপর ১৩৪৬ হিজরীতে বাদশা আবদুল আযীয আল সাউদ এই গিলাফ প্রস্তুত করার জন্য মক্কায় স্বতন্ত্রভাবে কারখানা নির্মাণের প্রত্যাদেশ জারি করেন। সে থেকে এখন পর্যন্ত কাবাগৃহের ওপর মক্কার কারখানাতে প্রস্তুতকৃত গিলাফই ঝোলানো হয়।

কাবাঘরের গিলাফ দামি কাপড় দিয়ে ও নান্দনিক ডিজাইনে তৈরি করা হয়ে থাকে। গিলাফ কখনো পশম দ্বারা তৈরি করা হয়; আবার কখনো চামড়া দিয়ে; কখনো বা জলছাপের মাধ্যমে। কখনো ইয়ামানের প্রসিদ্ধ কাপড় নুমারিক দিয়ে কাবার গিলাফ তৈরি করা হয়। কখনো কালো, কখনো লাল অথবা সাদা রঙে।

বর্তমানে কাবাঘরের গিলাফ খাঁটি রেশম দ্বারা তৈরি করা হয়। যার উপর কালো রঙ করা হয়ে থাকে। গিলাফের উপর চমৎকার ও নান্দনিক সূচিকর্মের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন আরবী ইবারত লেখা হয়। যেমন:

لِلّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ– يَا حَنَّانُ– سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

শেষের বাক্য দুটি আরবীতে ক্যালিগ্রাফি করে লেখা হয়। এর মাধ্যমে পুরো গিলাফকে সজ্জিত করা হয়।

গিলাফের উচ্চতা ১৪.৫ মিটার। গিলাফের উপরের তৃতীয় অংশে একটি স্ট্রিপ রয়েছে; এটি খাঁটি রূপার তারে বোনা। রূপার পরিমাণই ৯৯ শতাংশ। তাতে ১ শতাংশ সোনাও রয়েছে। এই গিলাফের দৈর্ঘ্য ৪৭ মিটার এবং প্রস্থ ৯৫ সেন্টিমিটার। এই পর্দাটি মোট ১৬ পার্টে বিভক্ত।

দরজার ওপরও একটি পর্দা ঝোলানো রয়েছে। এটিকে বোরকা বলে। ওই পর্দার বুনন এবং গঠন এটিকে বাকিয়্যাহ পর্দা থেকে বিশেষিত করেছে। এর দৈর্ঘ্য ৭.৫ মিটার এবং প্রস্থ ৪ মিটার। দরজায় ঝোলানো এই পর্দার প্রথা শুরু হয় ৮১০ হিজরী থেকে।

বাইতুল্লাহ শরীফের গিলাফ প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে পরিবর্তন করা হয়। পুরোনো গিলাফ খুলে নতুন গিলাফ ঝোলানো হয়।

**কাবাঘরের আভ্যন্তরীণ গিলাফ**

কাবাঘরের ভেতরে গিলাফ ব্যবহারের প্রথা আব্বাসী যুগে শুরু হয়েছিল। কিন্তু গিলাফ পরিবর্তনের কোনো নীতিমালা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি তখন। মামলুক এবং উসমানী সুলতানগণ এই প্রথা চালু করেন যে, যখন মক্কার কারও হাতে ক্ষমতা আসত, তখনই কেবল সেই নতুন আমীর বাইতুল্লাহর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ভেতরে ও বাহিরের পর্দা তৈরি করে পাঠাতেন। তখনও বাহিরের গিলাফ ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছরই পরিবর্তন করা হতো। সৌদি আরব প্রতিষ্ঠার পর কাবার গিলাফ তৈরির জন্য বিশেষায়িত কারখানা স্থাপন করা হলে ভিতর এবং বাইরের উভয় গিলাফ ঐ কারখানা থেকেই তৈরি করার নিয়ম চালু হয়। ১৪০৩ হিজরীতে প্রথমবার ভেতরের গিলাফ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়। এরপর তিন থেকে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে এই পর্দা পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। কাবার ভেতরকার ছাদকে হীরক-রঙের খাঁটি রেশমি গিলাফ দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং এর ওপরে সাদা রঙের সূচিকর্ম করা হয়।

**কাবাঘরের আভ্যন্তরীণ আকার**

কাবাঘরের ফ্লোর সাদাবর্ণের মর্মর পাথরে নির্মিত। এর আশপাশে কালো পাথরের রেখা রয়েছে। কাবার অভ্যন্তরে ফ্লোর থেকে চার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত কালো টালি লাগানো হয়েছে। টালিগুলো কাবার দেয়াল থেকে সামান্য দূরত্বে লাগানো হয়েছে। দেয়ালের বাকি অংশ এবং ছাদ পর্দায় সজ্জিত।

কাবাঘরের অভ্যন্তরে তিনটি কাঠের খুঁটি রয়েছে । এগুলো কাবাঘরের ঠিক মাঝে অবস্থিত। ছাদের ভার এগুলোর উপরই ন্যাস্ত। ওই খুঁটিগুলো একেকটির উচ্চতা ৯ মিটার। সাইজ ৪৪ সেন্টিমিটার। দুই খুঁটির মাঝের দূরত্ব ২.৩৫ মিটার। কাবাঘরের দেয়ালে কালো রঙের টালি

লাগানো হয়েছে। এটি এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে হুযুর ﷺ এর সালাত আদায়ের জায়গাটি চিহ্নিত করা যায়।

কাবাঘরে প্রবেশকারী ব্যক্তির ডানপাশে সিঁড়ি পড়ে এটি সোজা ছাদে উঠে গেছে। এই সিঁড়ি অত্যন্ত মজবুত সিসা দ্বারা নির্মিত। সিঁড়ির ধাপের সংখ্যা ৫০টি। সিঁড়ির গেট রয়েছে একটি । নাম বাবুত তাওবা, এ নামেই সিঁড়িটি প্রসিদ্ধ। কাবাঘরের অভ্যন্তরে একটি বিরাট সিন্দুকও রয়েছে। সিন্দুকে কাবাঘর সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলীল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা আছে।

**মাতাফ**

কাবাঘরের চারপাশের খোলা আঙিনাকে বলা হয় 'মাতাফ', যেখানে সম্মানিত হাজীগণ তাওয়াফ করেন। মাতাফের আঙিনার যমীন পাকা করা ছিল না, মাটিই ছিল। ৯১ হিজরীতে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক প্রথমবারের মতো মাতাফকে পাকা করেন। সেবার ফ্লোরে মর্মর পাথর ব্যবহার করা হয়। সময় গড়ানোর সাথে সাথে মাতাফের সংস্কারও হতে থাকে বারংবার। যেমন: যমযম কূপের সংস্কার, মিম্বার নির্মাণ, মাকামে ইবরাহীমের নির্মাণ; এমনকি চারটি মিহরাবও বসানো হয়। যেগুলোতে চার মাযহাবেরই আলাদা আলাদা জায়নামায ছিল।

হিজরী ১৪ শতকের শেষ দিকে হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে খেয়াল করে মাতাফে নির্মিত সমস্ত স্থাপনা ভেঙে মাতাফ আরো প্রশস্ত করা হয়, যাতে তাওয়াফকারীরা নির্বিঘ্নে তাওয়াফ করতে পারেন। ১৩৯৯ হিজরীতে মাতাফের সাথে লাগোয়া কিছু জায়গাকে মাতাফের অংশে পরিণত করা হয়। সম্প্রসারণের পর মাতাফের সর্বমোট আয়তন হয়েছে ১৭,০০০ মিটারে।

**মাকামে ইবরাহীম**

এটি জান্নাতের একটি পাথর। ইবরাহীম (আ.) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)কে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবা গৃহ নির্মাণকালে জিবরাঈল (আ.) নির্মাণ কাজে সুবিধার্থে জান্নাত থেকে এই পাথরটি নিয়ে এসেছিলেন। এতে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন, ফলে এর উপর তাঁর পায়ের ছাপ তৈরি হয়। ইবরাহীম (আ.) এর পদচিহ্নের দৈর্ঘ্য ২২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ১১ সেন্টিমিটার।

কাবাঘর নির্মাণ সম্পন্ন করার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) এটির উপর দাঁড়ান এবং আল্লাহ তাআলার আদেশে লোকদের উদ্দেশ্যে হজ্জে বাইতুল্লাহর আহবান করেন।

মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান হাজরে আসওয়াদের পূর্বদিকে ১৪.৫ মিটার ও কাবাঘরের শাজরওয়ান থেকে ১৩.২৫ মিটার দূরত্বে।

মাকামে ইবরাহীম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তার আপন স্থানেই বিদ্যমান আছে; তবে ১৭ হিজরীতে মক্কায় এক বিরাট প্লাবন হয়েছিল। সেই প্লাবনে স্রোতের টানে মাকামে ইবরাহীমের পাথরখণ্ডটি মিসফালাহ পর্যন্ত চলে যায়। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) সেটিকে তার পূর্বের জায়গায় পুনঃস্থাপন করেন।

মাকামে ইবরাহীম আব্বাসী খলীফা মাহদী সর্বপ্রথম ১৬১ হিজরীতে স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত করেন। পরবর্তীতে মাকামে ইবরাহীমকে একটি চারকোণবিশিষ্ট খোলের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং খোলটাকে রাখা হয় চারটি খুঁটির উপর; যার আয়তন ১৮ মিটার।

মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা কুরআন এবং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيمَ مُصَلًى

-এবং মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নাও। (সূরা বাকারা, আয়াত-১২৫)

فِيْهِ آيَةٌ بَيِّنَتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيمَ

-তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। যেমন মাকামে ইবরাহীম। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৭)

হাদীস শরীফে এসেছে- রুকন (অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ) এবং মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের মূল্যবান ইয়াকূত পাথরসমূহের মধ্য থেকে দুটি ইয়াকূত। আল্লাহ তাআলা এগুলোর জ্যোতিকে নষ্ট করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ তাআলা এগুলোর জ্যোতিকে নষ্ট না করতেন, তাহলে এ দুটি পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী সবকিছুকে জ্যোতির্ময় করে তুলতো। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস-৮৭৮)

**হাতিম**

কাবাঘরের উত্তরে অর্ধাকৃতির বৃত্তের মতো জায়গাটিকে হাতিম অথবা হুজরে ইসমাইল বলা হয়। এর উচ্চতা ১৩০ মিটার, প্রস্থ ১.৫ মিটার। এর দৈর্ঘ্য কাবার দেয়াল থেকে হাতিমের শেষ প্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত ৮.৫ মিটার । এই জায়গাটিকে হুজরে ইসমাইল বলার কারণ হলো- এই জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাইল (আ.) এবং তাঁর মাতা হযরত হাজার (আ.) এর বসবাসের জন্য ইরাকে উৎপাদিত কাঠের দ্বারা একটি ঝুপড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ৫/৯৮ এবং আখবারে মক্কা)

আরেকটি রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে, হযরত ইসমাইল (আ.) এর সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা ঘটনাটি সঠিক নয়। বরং ঘটনা হলো এই- কুরাইশরা যখন কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করে, সেসময় নির্মাণে হালাল সম্পদ ব্যয়ের শর্তারোপ করা হয়। তখন হালাল মাল যেটুকু নির্মাণকারীদের হস্তগত হয়, সেটুকু এতো অধিক পরিমাণ ছিল না যে, সমগ্র কাবাঘরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। যেমনটা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যামানায় ছিল। তাই অপারগ হয়ে কুরাইশরা কাবাঘরের উত্তরাংশকে ফাঁকা রেখে দেয়। এই ফাঁকা স্থানটি ছিল ৩ মিটারের মতো। অতঃপর এর চারপাশে দেয়াল তুলে দেওয়া হয়। যাতে করে তাওয়াফকারীগণ এর বাহিরে দিয়ে তাওয়াফ চালিয়ে যায়। এভাবেই এ স্থানের নাম হুজরে ইসমাইল হয়ে যায়।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন- হে আয়িশা! যদি তোমার গোত্র জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হতো, তাহলে আমি কাবাকে ভেঙে এর যমীনকে ভূমির বরাবর করে দিতাম এবং কাবার উভয় দরজাই খুলে দিতাম। একটা পূর্বের, অপরটা পশ্চিমের। এবং হাতিম পর্যন্ত কাবাকে ছয় হাত বৃদ্ধি করতাম। কুরাইশরা তাদের নির্মাণে এই ছয় হাত যমীনকে ছেড়ে দিয়েছিল। (মুসলিম, বাবু নাকজুল কাবাতি; হাদীস-১৩৩৩)

হাতিমের ফদীলতসমূহের মধ্যে এও আছে যে, কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া আর হাতিমে নামায পড়ার ফদীলত একই। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি কাবা ঘরের ভিতরে নামায আদায় করতে চাইলাম, তখন রাসূল ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হাতিমে প্রবেশ করান এবং বলেন- যদি তুমি বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করে নামায পড়তে চাও, তাহলে এখানেই নামায পড়ে নাও। নিঃসন্দেহে এই স্থানটি বাইতুল্লাহরই অংশ। (তিরমিযী, হাদীস-৮৭৬ এবং রাবী বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ)

**যমযম**

ইসমাঈল (আ.) এবং তাঁর মাতা হযরত হাজার (আ.)কে যখন ইবরাহীম (আ.) মক্কা শরীফে রেখে গিয়েছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ.) এর ডানার আঘাতে ইসমাঈল (আ.) এর পায়ের নিচে যে পানি প্রবাহিত হয়েছিলে, সেটিই হচ্ছে যমযম কূপ।

এই পবিত্র কূপ হাজরে আসওয়াদ থেকে ২০.৬০ মিটার দূরত্বে। এর গভীরতা আনুমানিক ৩০.৫ মিটার। যমযম কূপের পানির মাধ্যমে সমগ্র মক্কা নগরীর পানির প্রয়োজন বছরের পর বছর ধরে পূর্ণ হয়ে আসছে। রাসূল (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে দীর্ঘকাল এই কূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর দাদা খাযা আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে পুনরায় এ কূপের সন্ধান লাভ করেন।

যমযম পানির ব্যাপারে হাদীসের কিতাবে অনেক কথা আছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন- সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ পানি হলো যমযমের পানি। এতে খাবারের তৃপ্তি রয়েছে; আর রয়েছে রোগের আরোগ্যতা। (তাবরানি ফিল কাবির ১১/৯৮; মিনজারি তারগিব ২/২০৯)

হযরত জাবির (রা.) বলেন, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন- যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পানি কার্যকর।

এটি বরকতময় পানি; হুযুর ﷺ থুথু নিক্ষেপ করে একে আরও বরকতময় করেন তোলেন। এই পানি সেই যুগ থেকে নিয়ে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র মক্কাবাসী এবং অগণিত সম্মানিত হাজী ও পর্যটকদের পরিতৃপ্ত করে আসছে।

# প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর
# কী পেল বাংলাদেশ?

আবু তাহা



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গত ২১ ও ২২ জুন দুদিনের ভারত সফর ও বাংলাদেশের প্রাপ্যতা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে পক্ষে–বিপক্ষে তীব্র আলোচনার ঝড়। ভারত সফর এবং বাংলাদেশ কী পেলো, আর ভারত কী পেলো এ নিয়ে রাজনৈতিক মহল বেশ সরগরম। চলছে ব্যাপক আলাপ আলোচনা। যথারীতি বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত সফরকে ব্যর্থ এবং নিষ্ফল বলেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বলছে, ভারত সফরে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে 'একপাক্ষিক' দাবি করে বিরোধী দল বিএনপি বলেছে, বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে ভারতের গোলামি চুক্তির ফাঁদে ফেলা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে।

নানা কারণেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে বাংলাদেশের পাওনা নিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। ভারতের সাথে যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে তা সবিস্তারে সরকার প্রকাশ না করলেও এ থেকে ভারত ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছে। আর বাংলাদেশের ভাগ্যে বলা যায় তেমন কিছুই জোটেনি। ভারতের সাথে যে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই করা হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবগুলোই বাংলাদেশের 'উত্তরাঞ্চল কেন্দ্রিক'। বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে ব্যবহার করে উত্তরাঞ্চলে নতুন করে রেল ট্রানজিট সুবিধা পেয়েছে ভারত। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভারতকে রেল ট্রানজিট দেওয়ার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের কোনও ক্ষতি হবে না। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী

রাজশাহী-কলকাতার নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম-কলকাতা বাস চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিনটি ট্রেন যাতায়াত করে। ঢাকা-কলকাতা, খুলনা-কলকাতা ও ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি। এই তিনটি ছাড়া দ্রুততম সময়ে রাজশাহী-কলকাতা রুটেও এবার নতুন ট্রেন সার্ভিস চালুর কথা রয়েছে।

তবে যে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে তা হল ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ করতে পারার সমঝোতা। ভারতের ট্রেন বাংলাদেশের দর্শনা দিয়ে প্রবেশ করে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাবে। কিন্তু কী পণ্য যাবে তার উল্লেখ নেই। সাধারণ পণ্য যাবে না অস্ত্র যাবে তার উল্লেখ নেই। কারণ ভারতের উত্তর–পূর্বাঞ্চলে অরুনাচলে সীমান্ত নিয়ে চীন–ভারতের বিরোধের কথা সবার জানা। পরীক্ষামূলকভাবে খুব শিগগিরই বাংলাদেশ দিয়ে ভারতের এই ট্রেন চলবে। এই ট্রানজিট নিয়ে বিশ্লেষকরা মনে করেন, এ ধরনের 'রেল করিডোর' প্রদান আত্মঘাতী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী।

বাংলাদেশের প্রধান দাবি তিস্তার পানি। কিন্তু এই পানি পাওয়া নিয়ে কোন চুক্তি হয়নি, যা হয়েছে তা হলো, তিস্তার বিষয়ে বাংলাদেশে ভারত টেকনিক্যাল টিম পাঠাবে। কিন্তু এই টেকনিক্যাল টিমের কি কাজ তা স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি। বাংলাদেশ তিস্তার পানি পাবে তেমন কোন আভাসও নেই। অর্থাৎ তিস্তার বিষয়ে একধরনের অস্বচ্ছতাই রয়ে গেল । অথচ তিস্তার পানি পওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণের কাছে প্রধান অধিকারের বিষয়। বাংলাদেশ পানি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি না পেলেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যপাধ্যায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিস্তা নিয়ে বাংলাদেশে ভারত টেকনিক্যাল টিম পাঠানো ও এ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের সাথে কথা বলায়। অথচ বাংলাদেশে ভারতের যে টেকনিক্যাল টিম পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, তারা শুধু বাংলাদেশের অংশে কাজ করবে। তাহলে তিস্তা অববাহিকা নিয়ে আগের দৃষ্টিভঙ্গি কোথায় গেল? তিস্তা অববাহিকা এবং তিস্তার পানি নিয়ে কোন আলোচনাই হলো না।

কী পেল বাংলাদেশ?

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয়ে রয়ে গেছে যার সমাধান ভারতের হাতে। এই বিষয়গুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিস্তার পানি বণ্টন, ভিসা অনুমোদন পদ্ধতি সরলীকরণ, সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধ এবং দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা। এছাড়া ২০২৬ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নবায়ন। কিন্তু এসবের কিছু কি পেল বাংলাদেশ? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর শেষে দেশে ফেরার পর এই প্রশ্নটাই এখন সবার মাঝে। তিস্তার পানি পাওয়া নিয়ে কার্যত: কোনো আলাপ হয়নি দুই দেশের। পশ্চিমবঙ্গে গাজলডোবা বাঁধের কারণে তিস্তায় পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। গঙ্গা চুক্তি হলেও প্রয়োজনমতো পানি পাচ্ছে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বছরের পর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। ভারতের এই পানি আগ্রাসনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি হুমকির মুখে। শীতের সময় বাংলাদেশে পানির চাহিদা বেশি থাকে। দুই দেশের পানি বিশেষজ্ঞরা একে শুষ্ককালীন মৌসুম বলে থাকেন। শীতকালীন ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় না পানি সংকটের কারণে। অন্যদিকে বর্ষাকালে পানির চাহিদা না থাকলেও ভারত এই সময়ে ফারাক্কা, গাজলডোবা, টিপাইমুখ সব বাঁধের দরজা খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে পানিতে ভাসিয়ে দেয়। চলতি বছরেও তাই হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চল ও সিলেট বিভাগ বন্যায় ভেসেছে। ভারতের এই আচরণ কি বন্ধু সুলভ? তারপরও আমাদের বলতে হয় ভারত আমাদের বন্ধু। বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরবেন। এছাড়াও দুই দেশের ভেতর যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো আছে, সেই অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে তারা আরও সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২০১১ সালে দুই দেশের অভিন্ন নদীর পানি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যে ফ্রেমওয়ার্ক করা হয়েছিল, সেখানে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমাধানের দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এবার ভারত তেমন কিছুই দেয়নি। এক কথায় আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ভারতের দিক থেকে যে উদ্যোগের প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। আর কিছু আলোচনা হয়ে থাকলেও দুই দেশের ঘোষণাপত্রে তার প্রতিফলন হয়নি।

নেপাল, ভুটান ও ভারতের সেভেন সিস্টারে বাংলাদেশের পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে। কিন্তু নেপাল, ভুটান ও ভারতের উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় বাজারে বাংলাদেশের পণ্য সরাসরি যেতে পারে না ভারতের বাধার কারণে । সামান্য করিডোর দিলে কিংবা কয়েক কিলোমিটার ভারতের ভিতর দিয়ে টানেল তৈরির সুযোগ দিলে বাংলাদেশ স্থলপথে সরাসরি ব্যবসা করতে পারে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে। অথচ এ ধরনের কোনো আলোচনা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে না। ভারত যদি নিরাপত্তার কারণে ওপর দিয়ে যেতে বাধা দেয় তবে নিচ দিয়ে যাবার সুযোগ করে দিক। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বন্ধু সুলভ আচরণ হলে এতে ভারতের আপত্তি থাকার কথা নয়। অথচ বাংলাদেশের চট্রগ্রাম বন্দর ভারত ব্যবহার করে পণ্য নিচ্ছে তার ত্রিরপুরা ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয়। এছাড়া ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের পদ্মা সেতু দিয়ে কলকাতা– আগরতলা রেল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে গেছে। এতে ভারত ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। অন্যদিকে নতুন সমঝোতাস্মারকের আওতায় ভারতের ট্রেন বাংলাদেশের দর্শনা দিয়ে প্রবেশ করে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যাবে। কিন্তু বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নতি না করেই ভারতের ট্রেন চলাচল শুরু হলে তা হবে বাংলাদেশের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি। এই ট্রেন চলাচলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাড়তি চাপ তৈরি হবে। এতসবের প্রতিদানস্বরূপ বাংলাদেশকেও ভারতের স্থল সীমান্তগুলো ব্যবহার করে নেপাল, ভুটান ও সেভেন সিস্টারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

এছাড়া সীমান্ত হত্যা একটি অন্যতম বিষয়। প্রধানমন্ত্রী পর্যায় থেকে শুরু করে ভারতের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ছিল সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা হবে । কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বৈঠকে সীমান্ত হত্যা নিয়ে কোনো ধরনের ঘোষণাই দেখা যায়নি। বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু হলে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে হত্যা কি কারণে? ভারতের সঙ্গে নেপাল, ভুটান, চীন, পাকিস্তান, মিয়ানমার সীমান্ত রয়েছে। ওই সীমান্তগুলো বছরজুড়ে শান্ত থাকে। অথচ বাংলাদেশের সীমান্তে এমন কি ঘটে যেখানে বিএসএফকে গুলি করে বাংলাদেশীদের হত্যা করতে হবে?

এদিকে বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রয়োজনে পিঁয়াজ, আদা, রসুন, আলু, চিনি, গমসহ নানা পণ্য আমদানি করে থাকে। কিন্তু ভারত হুট-হাট করে তা রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এতে বেকায়দায় পড়ে বাংলাদেশের আমদানিকারকরা। হঠাৎ করেই বাংলাদেশে এসব পণ্যের দাম বেড়ে যায়। কষ্ট পায় জনগণ । এটাও বন্ধুসুলভ আচরণ হতে পারে না। আর এ বিষয়টিও এবারের আলোচনায় স্থান পায়নি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারতের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা দরকার।




মনীষী

# জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও তাঁর ধর্মদর্শন

আ. শ. ম. বাবর আলী

প্রখ্যাত ভাষাবিদ জ্ঞানতাপস মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে। পিতার নাম মুনশী মফীজুদ্দীন আহমদ। মা হুরুন্নেছা খাতুন।

অতি শৈশবে নিজ গ্রামের একটা পাঠশালাতে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৮৯৫ সালে ১০ বছর বয়সে তিনি পিতার কর্মস্থল হাওড়ার একটা মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৯ সালে সেখান থেকে এম.ই.পাশ করার পর ১৯০০ সালে হাওড়া জেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে (বর্তমান সপ্তম শ্রেণি) ভর্তি হন। উক্ত স্কুলের ফার্সি ভাষার মৌলভী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত কড়া মেজাজের শিক্ষক। তাই উক্ত মৌলভী সাহেবের কঠোর শাসনের ভয়ে ফার্সির বদলে সংস্কৃতকে তিনি বিশেষ পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য স্কুলে ফার্সিকে পাঠ্য হিসেবে না নিলেও বাড়িতে নিজ প্রচেষ্টায় ফার্সি, আরবী, উর্দু, হিন্দি, উড়িয়া, গ্রিক, তামিল প্রভৃতি ভাষা তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৪ সালে উক্ত স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। উল্লেখ্য যে, স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষাতে তিনি প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানের মধ্যে অবস্থান করতেন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করার পর তিনি ভর্তি হন কলকাতা মাদরাসা কলেজে। উক্ত কলেজটি তখন ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখান থেকে ১৯০৬ সালে তিনি এফ.এ. পাস করেন। এরপর সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ.তে ভর্তি হন হুগলি কলেজে। কিন্তু পরীক্ষার সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভাল ফল করতে পারেননি। এসময় আর্থিক দিক দিয়ে তাঁর পরিবারে বেশ কিছুটা অসচ্ছলতা আসে। তাই পড়াশুনা স্থগিত রেখে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন যশোর জেলা স্কুলে।

এখানে কিছুদিন চাকরি করার পর একই বিষয় নিয়ে আবার ভর্তি হন কলকাতা সিটি কলেজে। ১৯১০ সালে উক্ত কলেজ থেকে তিনি বি.এ.পাস করেন।

এরপর সংস্কৃত নিয়ে এম.এ.তে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ অসুবিধার কারণে বাধ্য হয়ে তিনি উক্ত বিষয় ছেড়ে দিয়ে 'তুলনামূলক শব্দশাস্ত্র' গ্রহণ করেন এবং ১৯১১ সালে উক্ত বিষয়ে এম.এ.পাস করেন। ১৯১৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছরেই ওকালতি শুরু করেন বশিরহাট মহকুমা আদালতে। বেশ কিছুদিন ওকালতি করার পর ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। দু'বছর সেখানে অধ্যাপনা করার পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত বছরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত একটানা ২৩ বছর উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের খন্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যাপনাকালে ১৯২৬ সালে দু'বছরের ছুটি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি প্যারিস যান। সেখানকার সোরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পারসিক, তিব্বত ও তুলনামূলক শব্দশাস্ত্র'র ওপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ভারতীয় মুসলমান এমনতর উচ্চ ডিগ্রি লাভ এটাই প্রথম। এখানে থাকাকালে তিনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে জার্মানির ফ্রাইবুক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে তিনি অধ্যয়ন করেন।

১৯৪৪ সালে যোগদান করেন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ পদে। চার বছরকাল তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর ১৯৪৮ সালে আবার ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এখানেই অধ্যাপনা করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল উদ্দেশ্য। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি গবেষণাধর্মী লেখা শুরু করেন। এ সময় থেকেই বিভিন্ন পত্রিকাতে তাঁর মূল্যবান লেখাসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকা ছিল না, যেখানে তাঁর লেখা ছাপা হয়নি। কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি করেন। এগুলোর মধ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'বঙ্গভূমি', 'আল ইসলাম', 'তকবীর', 'দি পিস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পত্রিকাটি ছিল ইংরেজি ত্রৈমাসিক। এছাড়া 'আঙ্গুর' নামে একটি শিশু পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯২০ সালে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮৬। এর মধ্যে মৌলিক রচনা ১৩, অনুবাদ ২৭, পাঠ্যপুস্তক ৪১ এবং সম্পাদিত গ্রন্থ ৫। এছাড়াও পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা অসংখ্য।

তাঁর প্রতিটি রচনাই গবেষণামূলক। তাঁর লেখা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', বাংলা সাহিত্যের কথা', 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' প্রভৃতি গবেষণাগ্রন্থসমূহ আমাদের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর 'ছোটদের রছুলুল্লাহ (দঃ)' এবং 'সেকালের রূপকথা' গ্রন্থ দু'খানি ছোটদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শুধুমাত্র উপমহাদেশের নয়, সম্ভবত বিশ্বের শ্রেষ্টতম ভাষাবিদ ছিলেন। বিশ্বের মোট চল্লিশটি ভাষা তিনি জানতেন। এর মধ্যে আঠারোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারতেন।

মূলত তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার। সারাটি জীবনই তিনি জ্ঞানসাধনা, জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিস্তার করে গেছেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিমাপ ছিল না। তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করতে গিয়ে কেউ তাঁকে বলেছেন' জ্ঞান তাপস', কেউ বলেছেন 'জীবন্ত অভিধান', কেউ বলেছেন 'চলন্ত বিশ্বকোষ', কেউ বলেছেন 'এ যুগের আল বিরুনী'। কিন্তু এর কোনোটাই দিয়ে, এমনকি একসঙ্গে সবগুলো দিয়েও তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

**ধর্মদর্শন**

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যক্তিগত জীবন, কর্মসাধনা এবং দার্শনিকতায় একজন অধ্যাত্ম কামিল ব্যক্তি ছিলেন। পৈত্রিক সূত্রেই তিনি এই আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর অনুসারী। পিতা মুনশী মফীজুদ্দীন আহমদ ছিলেন ফুরফুরার পীর কিবলাহ হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) এর অন্যতম মুরীদ। পরবর্তীতে তিনিও ফুরফুরা পীর ছাহেবের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

শৈশবকাল থেকেই শহীদুল্লাহ সাহেব ধর্মীয় জীবনের প্রতি অনুরাগী হন। এ সময় থেকেই তিনি কুরআনের অনুবাদসহ অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করতঃ ইসলামের প্রতিটি অনুশাসন দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে থাকেন। ফুরফুরা দরবারে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। পীর কিবলাহর প্রতিটি নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে জীবন গঠনের চেষ্টা করতেন। ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেই তিনি তাঁর পীরের কাছ থেকে দুআ নিতে ছুটে যান। তাঁর ইসলামী আচার-আচরণ ও জীবনধারায় পীর ছাহেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। পীর ছাহেব যখন বিভিন্ন মজলিসে যেতেন, যোগ্যতম মুরীদ শহীদুল্লাহ সাহেবকে সাথে নিয়ে যেতেন। মাহফিলসমূহে তাঁকে ওয়ায-নসীহত করতে নির্দেশ দিতেন। তাঁর জীবনধর্মী অধ্যাত্ম বক্তব্যে শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন। মুগ্ধ হতেন পীর ছাহেব স্বয়ং। এই মুরীদের ওপর পীর ছাহেব এতবেশি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, শহীদুল্লাহ সাহেবকে তিনি আল্লামা, মাওলানা ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করেন এবং পরম সম্মানিত খিলাফত দান করেন।

দীর্ঘকাল তিনি পীরের সান্নিধ্যে কাটান। পীর ছাহেবের কাছ থেকেই তিনি ইলমে তাসাওউফ লাভ করেন। তিনি শরীআত, তরীকত, হাকীকতের মাধ্যমে মারিফতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যান। পরম উন্নতি ঘটে তাঁর রূহানী শক্তির। এমনিভাবে তিনি একজন অধ্যাত্ম পুরুষে পরিণত হন।

ইসলামের মূলনীতি সমূহের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ও অনুশীলনী ছিল। নামায পারতপক্ষে কাযা করতেন না। বিশেষ করে রাতের অধিকাংশ সময় তিনি অতিবাহিত করতেন যিকর আযকারে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে সেখানে এক সুন্দর ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে তোলেন। 'হল' ও বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে প্রায়ই কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী মাসআলা-মাসাঈল বর্ণনা করতেন। এভাবে নিজেকে তিনি ইসলাম প্রচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেন।

আর তা শুধু মৌখিক বক্তৃতায় নয়, লেখাতেও। অসংখ্য ইসলামী প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন বহু পত্রিকায়। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে আল ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, সুধাকর, মোসলেম হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, হানাফী, নবনূর, শরীয়াতে ইসলাম, মোহাম্মদী, ছুন্নতুল জামায়াত, সোলতান, হেদায়েত প্রভৃতি উল্লেখ্য। বেশকিছু ধর্মীয়গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোরআন প্রসঙ্গ, ইসলাম প্রসঙ্গ, নবী করীম মুহম্মদ ﷺ, ছোটদের রাসূলুল্লাহ ﷺ, প্রভৃতি।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনেপ্রাণে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল তাঁর ধর্মদর্শনের মূল কথা। তাই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস হয়েও সামান্য আত্মম্ভরিতা তাঁর মধ্যে ছিল না; বরং নিজকে তিনি মনে করতেন সবার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপনের মাধ্যমে সকল মানুষের সাথে সখ্যতা স্থাপনই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা এবং সাধনা। বলা বাহুল্য, এতে তিনি পরিপূর্ণরূপে সফলকাম হয়েছিলেন। ধর্ম মানুষকে মনুষ্যত্ব শেখায়– এ ধারণায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। তাই তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে পাশব স্বভাব আছে এবং ঐশ্বরিক গুণও আছে। পাশব স্বভাবকে দমন করে যদি ঐশ্বরিক গুণকে ফুটিয়ে তোলা যায়, তবেই সে প্রকৃত মানুষ হতে পারে।' তাঁর বিশ্বাস, আত্মার মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক গুণের প্রকাশ সম্ভব। অর্থাৎ ধর্মীয় চেতনাবোধ ছাড়া মানুষ পশুত্বে পরিণত হয়ে যায়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সে পশুরও অধম হয়ে পড়ে।

তাঁর জীবনের ব্রত ছিল অধ্যাত্ম সাধনার মাধ্যমে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করা। এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না।

তাঁর মতে, জীবাত্মার সাথে যখন পরমাত্মার সম্মিলন ঘটে, তখনই জীবাত্মা তথা মানবজীবনের ধর্মদর্শন পূর্ণ হয়। সত্যিকারভাবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হন। এটাই তাসাওউফ তত্ত্বের মূলকথা। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ধর্মীয়দর্শনে তাসাওউফ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সারাটা জীবন ধরে তিনি পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের সাধনা করেছেন। আর এই সাধনার মাধ্যমেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্যে। তাঁর প্রত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল এর প্রতিফলন। নিজের জন্য তিনি যত বেশি ভেবেছেন, তারচেয়ে অনেক বেশি ভেবেছেন স্রষ্টার প্রতি জীবের তথা বিশ্বমুসলিম সমাজের জন্য। একদিকে দরবেশী জীবন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, আর একদিকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইসলাম প্রচারের বিশেষ ভূমিকায়। আত্মশক্তির উৎকর্ষতা লাভের জন্য একদিকে যেমন আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য লাভের প্রয়োজন, অন্যদিকে বুযুর্গ ব্যক্তিদের মাযার যিয়ারতও অন্যতম কর্তব্য। এতে আত্মার মধ্যে ধর্মীয় শক্তির উন্মেষ ঘটে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ধর্মদর্শনের এটাও ছিল অন্যতম চেতনা। এই চেতনাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিভিন্ন সময় আউলিয়া কিরামের যিয়ারত করেন। এসব কামিল ওলীদের মধ্যে ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.), পীর হযরত বাকিবিল্লাহ (র.) হযরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.), হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র.) প্রমুখ। বহু পরিশ্রম করে এসব বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার তিনি যিয়ারত করেন।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য, 'আমরা মুসলমান। আমরা যদি চিন্তা-ভাবনায়, কথাবার্তায় পোশাক-পরিচ্ছদে এবং আহারে-বিহারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে লালন না করি, তা হলে জাতি হিসেবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আজকের পৃথিবী অশান্ত, মানুষ জড়বাদে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার বিশ্বাস নেই সেই জড়বাদে। দেহের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি আত্মারও খাদ্যের দরকার। সত্যিকার মুসলমান হতে গেলে কাজে, কথায়, চিন্তায় ও পোশাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।'

একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে এসব বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এ ধর্মদর্শনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। আর এ বিশ্বাসকে সাধনায় রেখে সারাটা জীবন ধরে তিনি লালন করে গেছেন। একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে।

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের একটি কেবিনে চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর অবিনশ্বর পবিত্র আত্মা চলে গেল পরমাত্মার সাথে মিলনের প্রত্যাশায়। আর নশ্বর তাঁর দেহ সমাহিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের পাশে কোমল মাটির সুশীতল শয়ানে।

**ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদিত কবিতা–**

কোনো দেশে গুণীর জন্ম হয় না প্রতিদিন
শোধ করা তো যায় না কভু গুণীজনের ঋণ।
দেশের সেরা সম্পদ যে গুণীজনরা তাই
ধনরত্ন তার সঙ্গে তুলনা তো নাই।
গুণীজনদের অবদানে সমৃদ্ধ হয় দেশ
গুণী ব্যক্তির অভাব হলে সব হয়ে যায় শেষ।
একটি দেশে যত বেশি গুণীর জন্ম হয়
সভ্যতাতে সেই দেশ পায় শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন গুণীজন
সাধনা তাঁর ছিল সদাই জ্ঞানের আহরণ।
অর্জিত সেই জ্ঞান বিলিয়ে দিলেন সবার মাঝে
দেশ জাতি আর ভাষা সাজান অলংকৃত সাজে।
জ্ঞান সাধনা ধর্মদর্শন সমান সমন্বয়
শহীদুল্লাহর মত এমন ক'জন মানুষ হয়?

ধর্ম-কর্ম সাধনায় তিনি ছিলেন সর্বদাই
ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ গর্ব মোদের তাই।

# এবার নেতানিয়াহুর নজর লেবাননের দিকে..

## মীর্জা গালিব



ফিলিস্তিনের গাযায় যুদ্ধের তীব্রতা কমিয়ে এবার লেবানন সীমান্তে আরও সেনা জড়ো করার ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সশস্ত্র হিযবুল্লাহ গোষ্ঠীর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে ইসরায়েলি বাহিনী এখন নজর বাড়াচ্ছে লেবাননের দিকে। যে কোন মুহূর্তে লেবাননের হিযবুল্লাহ গোষ্ঠীর ওপর সর্বাত্মক হামলা শুরু করতে পারে ইসরায়েল।

গাযায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই উত্তরের লেবানন সীমান্তে দেশটির হিযবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলি সেনাদের পাল্টাপাল্টি হামলা চলেছে। সম্প্রতি হামলার তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে দুই পক্ষের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেড়ে গেছে। যদিও লেবাননের সঙ্গে উত্তেজনা এড়াতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

গাযায় হামলার প্রতিবাদে ইসরায়েলে নিয়মিত রকেট হামলা চালাচ্ছে হিযবুল্লাহ। এ পরিস্থিতিতে কিরইয়াত শামোনা শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হিযবুল্লাহর হামলার পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। লেবাননের অভ্যন্তরে হিযবুল্লাহর অবস্থান নিশানা করে নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে তারা। হামলায় হিযবুল্লাহর একাধিক শীর্ষ কমান্ডার নিহত হয়েছেন।

এদিকে ইসরায়েলে ব্যাপক পরিসরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে হিযবুল্লাহ। এর মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতের মাত্রা আরও বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। চলতি মাসে হিযবুল্লাহ ড্রোন থেকে তোলা বেশ কিছু ভিডিও চিত্র প্রকাশ করেছে। এসব ভিডিও চিত্রে ইসরায়েলের হাইফা শহরে ইসরায়েলি বাহিনীর একাধিক সামরিক স্থাপনার পাশাপাশি বেসামরিক বিভিন্ন অবকাঠামোও দেখা গেছে।

সম্প্রতি ইসরায়েলি টেলিভিশন স্টেশন চ্যানেল ফোরটিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, গাযার সর্বদক্ষিণের নগরী রাফায় তাদের সেনা অভিযান শেষের দিকে। হামাসের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইও শেষের দিকে। তবে এর অর্থ এই নয় যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পথে। গাযায় যুদ্ধ চলতেই থাকবে। একই সঙ্গে হিযবুল্লাহকেও মুকাবিলা করবে ইসরায়েল। নেতানিয়াহু বলেন, 'আত্মরক্ষার খাতিরে' শিগগিরই তিনি উত্তর সীমান্তে বেশি সেনা মোতায়েন করবেন।

ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিযবুল্লাহর পাল্টাপাল্টি হুমকির পর জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, যদি ইসরায়েল ও হিযবুল্লাহর মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে সেটা হবে আরেকটি 'বিপর্যয়'।

পাল্টাপাল্টি হামলার মাত্রা দিন দিন বাড়ছেই। ইতোমধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে ৬০ হাজারের বেশি ইসরায়েলিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইসরায়েলের নেতারা বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালিয়ে হিযবুল্লাহকে পিছু হঠাতে চায়।

লেবানন সীমান্তের বিপজ্জনক এই অচলাবস্থা মূলত নির্ভর করছে দক্ষিণে ১০০ মাইল দূরে গাযায় ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলের সাফল্যের ওপর। কিন্তু ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীই স্বীকার করেছে হামাসকে যুদ্ধে নির্মূল করা সম্ভব নয়। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, গাযায় একটি যুদ্ধবিরতি হলে উত্তরেও উত্তেজনা প্রশমন হবে তা মনে হয়না। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু চান, দুই দিকেই সংঘাত অব্যাহত থাক। কট্টর ডানপন্থী সরকারের মিত্রদের কাছে হামাসকে নির্মূলের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অর্জন করতে চান তিনি।

অবশ্য নেতানিয়াহু ও তাঁর কট্টর ডানপন্থী মিত্রদের এ লক্ষ্য যে পূরণ হওয়ার নয় সেই ইঙ্গিত আসছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী থেকেই। গত মাসে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানেয়েল হাগারি জানিয়েছেন, হামাসকে নির্মূলের এই লক্ষ্য বাস্তবিক নয়। ইসরায়েলি সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা হামাসকে নির্মূল করতে পারব এমন কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।'

**আতঙ্ক লেবাননে**

এদিকে লেবাননের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারাও আছেন আতঙ্কে। ইসরায়েলি বাহিনীর নিয়মিত হামলার মুখে সীমান্তবর্তী এলাকার প্রায় এক লাখ বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখনো যারা তাদের বাড়িতে আছেন তাদেরও থাকতে হচ্ছে আতঙ্কের মধ্যেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কেউ বসতভিটা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না বলে ঝুঁকি নিয়ে থাকছেন।

ইসরায়েল সীমান্ত থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে লেবাননের জাবাল আল বতম এলাকার বাসিন্দা ফাতিমা বেলহাস। শুরুর দিকে বাড়ির আশপাশের এলাকায় বোমা হামলা হলে ভয় আর আতঙ্কে কেঁপে উঠতেন বলে জানালেন এই

নারী। বললেন, এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি হামলা চলছে। ধীরে ধীরে একটা সময় তা 'গা সওয়া' হওয়ায় এখন বাড়ি ছাড়তে চান না।

একইভাবে ডেভিড কামারি লেবানন সীমান্তবর্তী ইসরায়েলের ছোট শহর কিরইয়াত শামোনার বাসিন্দা। গত মাসে লেবানন থেকে ছোড়া হিযবুল্লাহর একটি রকেট গিয়ে আঘাত হানে তাঁর বাড়ির বাগানে। রকেটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁর বাড়ি। ডেভিড কামারি বলেন, 'দিনরাত সর্বদা বোমার আতঙ্ক। এটা এক বড় সমস্যা। আমার জন্ম এখানে। আপনি যদি এখানে একটি রাত থাকেন তাহলে পাগল হয়ে যাবেন।'

ইসরায়েলের সীমান্ত থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে লেবাননের একটি গ্রাম মাইস আল জাবাল। সেই গ্রামের বাসিন্দা হুসেইন আবাল্লান সম্প্রতি তাঁর বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তিনি বলেন, দিন দিন সেখানে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ থাকে না। এ ছাড়া গ্রামে বা আশপাশের এলাকায় কোনো দোকানও খোলা পাওয়া যায় না।

হুসেইন আবাল্লান বলেন, গ্রামে আর অল্প কিছু পরিবার আছে। মূলত যেসব পরিবারে প্রবীণেরা আছেন বা যাঁরা ফসলের খেত রেখে যেতে চান না তারাই রয়ে গেছেন। তবে হিযবুল্লাহ এখন ইসরায়েলে যে হামলা চালাচ্ছে তিনি তাঁর পক্ষে বলে জানালেন। বললেন, 'লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বছরের পর বছর ইসরায়েলি আগ্রাসনে বাস করছে। শুধু প্রতিরোধের মাধ্যমে আমরা শক্তিশালী হতে পারি।'

আতঙ্ক শুধু সীমান্তবর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই। লেবাননের রাজধানী বৈরুতেও অনেকে যুদ্ধের আতঙ্কে রয়েছেন। কেউ কেউ তো ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছেন। ঠিকঠাক করে রেখেছেন পাসপোর্ট। তাঁরা বলছেন, যদি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে যেন দ্রুত অন্যত্র যেতে পারেন বা দেশ ছাড়তে পারেন। হিযবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসারাল্লাও বলেছেন, যুদ্ধ শুরু হলে ইসরায়েলের কোনো অংশ বাদ যাবে না।

> লেবানন সীমান্তের বিপজ্জনক এই অচলাবস্থা মূলত নির্ভর করছে দক্ষিণে ১০০ মাইল দূরে গাযায় ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলের সাফল্যের ওপর। কিন্তু ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীই স্বীকার করেছে হামাসকে যুদ্ধে নির্মূল করা সম্ভব নয়। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, গাযায় একটি যুদ্ধবিরতি হলে উত্তরেও উত্তেজনা প্রশমন হবে তা মনে হয়না। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু চান, দুই দিকেই সংঘাত অব্যাহত থাক। কট্টর ডানপন্থী সরকারের মিত্রদের কাছে হামাসকে নির্মূলের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অর্জন করতে চান তিনি।

হিযবুল্লাহর কাছে রয়েছে যুদ্ধ করার মতো পর্যাপ্ত সমরাস্ত্র। ইরান তাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ পশ্চিমা দেশগুলোর। এদিকে বিশ্বের অত্যাধুনিক সব সমরাস্ত্র রয়েছে ইসরায়েলের কাছে। আর ইসরায়েলের অন্যতম মিত্র সামরিক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্লেষকেরা বলছেন, যদি ইসরায়েল ও হিযবুল্লাহর মধ্যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে তা মধ্যেপ্রাচ্যে বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাছাড়া ইরানে হিযবুল্লাহ হাজার হাজার তরুন প্রয়োজনে লেবাননে গিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত বলে ঘোষনা দিয়েছে। আর ইরান সরকার বলেছে, হিযবুল্লাহ নিজেকে ও লেবাননকে রক্ষা করতে সক্ষম। লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিযবুল্লাহর সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধে 'চূড়ান্ত পরাজিত' পক্ষ হবে ইসরায়েল।

### লেবানন সীমান্তে সেনা জড়ো করছেন নেতানিয়াহু

এদিকে কৌশলী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনের গাযায় যুদ্ধের তীব্রতা কমিয়ে লেবানন সীমান্তে আরও সেনা জড়ো করার ঘোষণা দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি বলেন, 'আত্মরক্ষার খাতিরে' শিগগিরই তিনি উত্তর সীমান্তে বেশি সেনা মোতায়েন করবেন।

এদিকে উলটো কথা বলেছেন, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, লেবাননের হিযবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী লেবাননকে প্রস্তরযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। তবে তাঁর সরকার এর পরিবর্তে ইসরায়েল-লেবানন সীমান্তে কূটনৈতিক সমাধানে আগ্রহী। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ–পরবর্তী গাযার শাসনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রও চাইছে হিযবুল্লাহর সঙ্গে যাতে ইসরায়েলের যুদ্ধ না বাঁধে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, আর যুদ্ধ নয়, ইসরায়েল ও লেবাননের বেসামরিক মানুষ যাতে তাদের ঘরবাড়িতে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য কাজ করছে ওয়াশিংটন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলেছেন, গত মে মাসে বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা থেকে সরে আসতে আলোচনা চলছে। শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রের চালান যাচ্ছে ইসরায়েলে। এদিকে ইসরায়েলের কাছে ভারত রকেট ও বিস্ফোরক বিক্রি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আলজাযিরা এ বিষয়ে এক প্রতিবেদনে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত গাযায় নিহত হয়েছেন ৩৭ হাজার ৭১৮ ফিলিস্তিনী; আহত হয়েছেন ৮৬ হাজার ৩৭৭ জন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন আরও কয়েক হাজার। শিশু নিহত হয়েছে প্রায় ১৪ হাজার। জাতিসংঘের মতে আরও ২০ হাজার ফিলিস্তিনী শিশু নিখোঁজ রয়েছে।

### শেষের কথা

গাযায় ইসরায়েলের হামলা ইতোমধ্যে ৯ মাসে গড়িয়েছে। আরব দেশগুলো অচিরেই এ যুদ্ধের বন্ধ চায়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান পশ্চিমা শক্তিগুলোকে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমারা এ অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। জাতিসংঘের বিদায়ী মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস সতর্ক করে বলেন, লেবাননে যুদ্ধের বিস্তার ডেকে আনবে সর্বনাশ। তিনি জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন, লেবাননের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে তা সিরিয়ায় টেনে আনা হবে। সিরিয়া আবার অন্যদের টানবে। এটি খুবই উদ্বেগজনক । অতএব পশ্চিমাদের উচিত ইসরায়েলকে এ যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করা।



# গাযায় বর্বরতার শেষ কোথায়...

মুহাম্মাদ বিন নূর

গাযায় চলমান ইসরায়েলি নৃশংসতার নয় মাস হতে চললো। প্রায় পৌনে এক বছর ধরে চলমান এই সহিংসতায় অবৈধ রাষ্ট্রের নৃশংস বর্বর মনোভাবের কোন পরিবর্তন চোখে না পড়লেও অন্য অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে। দখলদার রাষ্ট্রটির কট্টর সমর্থক রাষ্ট্রগুলোও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, সর্বশেষ ইসরায়েলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মার্কিন প্রেসিডেন্ট সামনে এনেছেন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। গত জুনের ১০ তারিখে সে প্রস্তাব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাসও হয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বারবার যদিও বলা হচ্ছে– এই প্রস্তাবে ইসরায়েলের সমর্থন আছে, ইসরায়েল কিন্তু সাফ জানিয়ে দিচ্ছে যে তারা হামস নির্মূল না করে কোন স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে যেতে রাজি নয় । এ এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা। এর আগে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে হামাস সম্মত হলেও ইসরায়েলের আপত্তিতে কার্যকর হয়নি, অথচ সেটির জন্য যুক্তরাষ্ট্র একটি বারের জন্যও ইসরায়েলকে দায়ি না করে দায়ি করেছে হামাসকে। এবার নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে ইসরায়েল স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করলেও এবং তার বিপরীতে হামাস কিছু সংশোধনের প্রস্তাবসহ স্বাগত জানালেও, বাইডেন প্রশাসন থেকে এবারও পুরো দায় হামাসের কাঁধে ফেলা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে হামাসের অবস্থান খুব স্পষ্ট— স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকরের পরই কেবল বন্দিবিনিময় হবে, তার আগে নয়। অন্যদিকে বাইডেনের প্রস্তাব হচ্ছে আপাতত সাময়িক বিরতিতে বন্দিবিনিময় হোক, তারপর স্থায়ী যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আলোচনা চলবে। অর্থাৎ— ওসলো চুক্তির সেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতো— অনন্তকাল ধরে কেবল আলোচনাই চলতে থাকবে। তাও ইসরায়েল এই প্রস্তাবের পক্ষে নয়, তারা কেবল প্রথম অংশ, অর্থাৎ সাময়িক বিরতিতে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে আগ্রহী। হামাস তথা প্রতিরোধযোদ্ধারা এমন আত্মঘাতী প্রস্তাবে যে কখনোই সাড়া দিচ্ছেন না, তা মোটামুটি নিশ্চিতই বলা চলে।

এদিকে এ যুদ্ধের ফলে ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দিনে দিনে খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। জুন মাসে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে দখলদার বাহিনী চারজন যুদ্ধবন্দীকে হামাসের হাত থেকে উদ্ধার করলেও দেশের ভিতরে এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় নেতানিয়াহু সরকার। আট মাস পর দু'শতাধিক ফিলিস্তিনীর প্রাণের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মাত্র চার বন্দিকে উদ্ধার যে আসলে দখলদাল সেনাবাহিনীর অক্ষমতারই পরিচায়ক, বন্দিদের স্বজনেরা তা বিলক্ষণ উপলব্ধি করছেন। এদিকে এই অভিযানে একাধিক ইসরায়েলি বন্দি নিহতের খবর জানিয়েছেন কাসসাম মুখপাত্র আবু উবাইদা, ইসরায়েল সেটা অস্বীকার করলেও তাদের জনগণ এতো দিনে বুঝতে পেরেছে যে এই যুদ্ধে তাদের নিজেদের সরকারের চেয়ে আবু উবাইদার বিবৃতি অধিক নির্ভরযোগ্য।আর এই অভিযানে নিহত না হলেও ইসরায়েলের হাতে মোট নিহত ইসরায়েলি বন্দির সংখ্যা যে উদ্ধারকৃত বন্দির চেয়ে অধিক, তা সকলেরই জানা।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে ইসরায়েলের ভিতর থেকে এমন সব কথা বেরিয়ে আসছে, যা কিনা এতোদিন কেবল ফিলিস্তিনপন্থী বিশ্লেষকদের বয়ানেই শুনা যেত। দখলদার বাহিনীর উর্ধ্বতন মুখপাত্র রিয়ার এডমিরাল দানিয়েল হাগারি গত উনিশ জুন ইসরায়েলি টিভি চ্যানেল স্বীকার করেন— হামাসকে ধ্বংস করা, নিশ্চিহ্ন করার দাবি করা- এক কথায় জনগণের চোখে ধুলা দেওয়ার শামিল। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তা যেই করুকনা কেন তার ধারণা ভুল। আরো অনেক প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের মুখে এমন কথা শুনা গেলেও এই প্রথম উর্ধ্বতন কোন বর্তমান কর্মকর্তার এমন স্বীকারোক্তি সামনে এলো। এ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে দখলদার বাহিনীর মনোবল এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে।

হামাস, সারায় আল কুদসসহ প্রতিরোধ যোদ্ধারা যে বাইরের বড় ধরনের সহযোগিতা ছাড়াই পৌনে এক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, এবং একই যুদ্ধক্ষেত্রে বারবার ফিরে আসতে হবে ইসরায়েলকে, বারবার অ্যাম্বুশে পড়তে হবে— অক্টোবরে এমন কথা হয়তো আমাদের মতো কট্টর প্রতিরোধযুদ্ধ সমর্থকদের জন্যও ছিল কল্পনাতীত। হামাসসহ অন্য প্রতিরোধ যোদ্ধারা ছয় মাস ময়দানে টিকে থাকতে পারবে কিনা, আমরা তখন সে চিন্তায় মশগুল ছিলাম। কিন্তু জুনের শেষ দিকে হামাস তাদের অস্ত্র কারখানার ছোট্ট একটি ভিডিও প্রকাশ করে যেন বার্তা দিলো, আরো বহু লম্বা যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততা আর ইসরায়েলের বর্বরতা দেখে মনে হচ্ছে এ যুদ্ধ সহজেই শেষ হওয়ার নয়। অক্টোবরে যারা যুদ্ধের প্রতিমুহূর্তের খবর রাখতেন, তাদের সিংহভাগও হয়তো এখন আর প্রতিমুহূর্তের খবর নেওয়ার সময় পাচ্ছেন না, কিন্তু ফিলিস্তিনের জনগণের অবিচলতায় একটুও চিড় ধরেনি। প্রতিরোধযোদ্ধারা মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, সাধারণ মানুষ এখনো তাদের সিদ্ধান্তকেই স্বাগত জানাচ্ছেন সবক্ষেত্র, পবিত্র ঈদুল আদহায় পশু কুরবানী দিতে না পারলেও নিজেদের জীবনের কুরবানী দিয়েই চলেছেন হাসিমুখে, এ যে সীমাহীন কুরবানীর মহোৎসব! অপরদিকে নেতানিয়াহুর স্ত্রী প্রকাশ্যে আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন, সেনাবাহিনী তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নেতানিয়াহু তার যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছেন, ইসরায়েলের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীলতা কেবল বেড়েই চলছে, লেবানন সীমান্তে হিযবুল্লাহর সাথে যুদ্ধের দামামা বাজছে, অর্থনীতি খাদের কিনারে, পর্যটনসহ অনেকগুলো খাত প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে, বাকি অর্থনৈতিক খাতসমূহও নিভুনিভু করছে, মিত্ররাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, গুগলের মতো মিত্র কোম্পানী তাদের কার্যালয় তেল আবিব আর হাইফা থেকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছে, সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যে কোন স্বাভাবিক রাষ্ট্রনায়কের জন্য যুদ্ধবিরতিই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত সমাধান হলেও ইসরায়েলের ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই ভিন্ন। কারণ দেশটির সরকার প্রধানের কাছে নিজ দেশের অর্থনীতি আর নিরাপত্তার চেয়ে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ক্যারিয়ারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর এ বিষয়ে মোটামুটি সবাই নিশ্চিত যে এ যুদ্ধের সমাপ্তিই হবে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি । আর সে কারণেই নেতানিয়াহু গাযায় যুদ্ধ শেষ না করেই লেবাননে যুদ্ধে জড়াতে চাচ্ছে। আর সেই সাথে রয়েছে উগ্র জায়নবাদি সমর্থকেরা, যারা বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝেই হামাস নির্মূলের স্লোগান তুলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী, যেখানে খোদ সেনাবাহিনীই স্বীকার করছে যে তাদের পক্ষে এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গাযা থেকে বের হওয়া এক কথায় অসম্ভব।

এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ আদৌ কখন শেষ হবে, গাযায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে নাকি ছড়িয়ে পড়বে পুরো অঞ্চলজুড়ে, তার কিছুই এখনই বলা কঠিন । তবে গাযার প্রতিরোধ যোদ্ধারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, ফলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন কায়েম হবেই, ইন শা-আল্লাহ।

# ভারতে মুসলিম ঐতিহ্য

রহমান মুখলেস

*(ভারতে রয়েছে মুসলিম শাসনের সহস্রাধিক বছরের ইতিহাস। আরব, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান যেখান থেকেই মুসলিমরা এসেছে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ। ইসলামী জীবনচর্চা ও শিল্পরীতি। ইসলামী শিল্প ঐতিহ্য। আর তাঁরা শুধু ভারত শাসনই করেননি, ভারতকে তাঁরা নিজের ভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা মিশে গেছেন এদেশের মানুষের সাথে। গড়ে তুলেছেন ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যের নানা স্থাপনা। মুসলিম শাসনামলে পুরো ভারতবর্ষেই ব্যাপক বিকাশ ঘটে মুসলিক ঐতিহ্যিক স্থাপনার। নির্মিত হয়েছে কুতুব মিনার থেকে তাজমহল। বিশেষ করে মসজিদ, সৌধ, সুদৃশ্য ইমারত খিলান, গম্বুয, সুউচ্চ মিনার ইত্যাদি ঐতিহ্যিক স্থাপত্য গড়ে উঠেছে। এসকল ঐতিহ্যিক স্থাপনার বিবরণ সম্বলিত 'ভারতে মুসলিম ঐতিহ্য' মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য ধারাবাহিক তুলে ধরা হচ্ছে।—সম্পাদক।)*

*(পূর্ব প্রকাশের পর)*

**শৈলকূপা মসজিদ**

বারবাজার ছাড়াও যশোরের শৈলকূপায় (বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলায়) অবস্থিত শৈলকূপা মসজিদ দক্ষিণাঞ্চলে সুলতানী আমলের এক অন্যতম মুসলিম স্থাপত্য কীর্তি। শৈলকূপার দরগাপাড়ায় অবস্থিত এ মসজিদটি একটি আয়তাকার বিশিষ্ট মসজিদ। দৈর্ঘ্য ২১ ফুট (ভিতরের দিকে) প্রস্থ ২১ ফুট (ভিতরের দিকে)। দেয়ালগুলো চওড়া সাড়ে ৫ ফুট। এর চারকোণে রয়েছে গোলাকার এবং বলয় আকারের স্ফীতরেখায় অলংকৃত (ব্যান্ড) ৪টি মিনার। আর এ মিনারগুলো মসজিদের ছাদ ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। মসজিদের কার্নিশ ঈষৎ বাঁকানো। পূর্বদিকের দেয়ালে ৩টি খিলান প্রবেশ পথ। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে দেয়ালে রয়েছে আরো দুটি প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব। মাঝেরটি বড়। মসজিদের ভেতর ৫ ফুট উঁচু। দুটি স্তম্ভ রয়েছে। এ দুটো স্তম্ভ এবং চারপাশের দেয়ালের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে ৬টি গম্বুয। মসজিদের ভেতরে স্তম্ভে রয়েছে খিলান ও ব্যান্ডের কাজ। এ মসজিদের পাশেই রয়েছে একটি মাযার। স্থানীয় লোকের মতে এটি শাহ মুহাম্মদ আরিফ-ই-রব্বানী ওরফে আরদ শাহর মাযার। এ মাযারটি প্রাচীর বেষ্টিত একটি উন্মুক্ত স্থানে। এর কাছাকাছি রয়েছে আরো ৬টি মাযার। সুলতান নসরত শাহর আমলে মসজিদ ও আরদ শাহর মাযার নির্মিত হয় বলে অনুমান করা হয়।

**বারবাজারের দিঘী**

বারবাজার এর মুসলিম কীর্তির মধ্যে এখানকার দিঘী ও পুকুরও অন্যতম। বারবাজারে চারদিকে যেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মসজিদ। তেমনিভাবে পুকুর ও দিঘী। অবশ্য আজ এর অনেক পুকুর ও দিঘী টিকে নেই। ভরাট হয়ে সেখানে এখন চলছে চাষাবাদ। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে দু'একটি পুকুর ও দিঘী ছাড়া বারবাজারের প্রায় সকল পুকুর ও দিঘী খনন হয়েছিল মুসলমান আমলে। স্থানীয় জনগনের মতে, এসব পুকুর ও দিঘীর অধিকাংশই খনন করেন হযরত খানজাহান আলী ও তার শিষ্যগণ। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্রের মতে তথায় (বারবাজার) ৬ কুড়ি ৬টা অর্থাৎ ১২৬টা পুকুর ও দিঘী রয়েছে। সতীশ চন্দ্রের মত এগুলো মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই কীর্তি- কোনটি হিন্দুর কীর্তি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, কোনটি মুসলমানদের কীর্তি- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। মুসলিম কীর্তির অন্যতম হচ্ছে- সওদাগর দিঘী, গলাকাটির দিঘী, চেরাগদানি দিঘী, মাজন খার দিঘী, পীরে পুকুর, শেকের পুকুর, যশোহর দিঘী, জোড়বাংলা দিঘী, কালু খার দিঘী ইত্যাদি। শ্রীরাম রাজার মায়ের নামে পরিচিতি লাভকারী রাণী মাতার দিঘীটিও মুসলমানদের কীর্তি।



**খানজাহান দিঘী**

যশোর থেকে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কেশবপুরে রয়েছে সুলতানী আমলের এক বিশাল দিঘী। জনশ্রুতি রয়েছে, খানজাহান আলী যশোর থেকে বাগেরহাট যাওয়ার পথে কেশবপুর এসেছিলেন এবং এ দিঘীটি তাঁর কীর্তি। তবে এ ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ নেই। খানজাহান আলী অভিহিত এ দিঘীটির আয়তন ২৩৫৮।১০৬২ ফুট। এর পাড়গুলো বেশ উঁচু। এখনও প্রতি বছর এই দিঘীর পাড়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে খানজাহান এর স্মৃতিকে স্মরণ করে মেলা বসে। কেশবপুর ছাড়াও মির্জানগরে খানজাহান আলীর আমলের ও মুঘল আমলের অনেক জলাশয় রয়েছে। (সমাপ্ত)

রঙ হোক আপনাদের
ভালোবাসার, ভালো লাগার
মুদ্রণ ও শৈল্পিক কাজের
শিল্পবন্ধু

রঙ প্রিন্টার্স
সৃষ্টিতে শৈল্পিক কারুকাজ

০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
০১৭৬৪ ০৩৬২৯০
rangprinter@gmail.com
rangprintersbd@gmail.com

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা)
বন্দরবাজার, সিলেট

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

# তোমার তুচ্ছ আমলও কবুল হবে যদি...

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

বেদুইন স্ত্রী সুচিন্তিত প্রস্তাব দিল, অভাব অনটনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে যেভাবেই হোক বাগদাদের খলীফার কাছে যেতে হবে, তার আনুকুল্য পেতে হবে। তা হলেই আমাদের ভাগ্য বদলাবে। স্বামী বলল, কীভাবে খালি হাতে খলীফার দরবারে যাব। আমি তো সহায় সম্বলহীন। স্ত্রী সান্ত্বনা দিল, বাদশাহর দরবারে যেতে হলে একটাই উপায় আছে, তা হলো সততার প্রমাণ রাখতে হবে বাস্তবে। আমাদের যে কিছুই নেই আর বাদশাহর আনুকুল্য পেতে আমাদের নিষ্ঠা ও আকুতির কমতি নেই তার সাক্ষ্য উপস্থিত করতে হবে। অর্থাৎ নিজেদের পরিশ্রমের সবচে প্রিয় জিনিসটি নিয়ে যেতে হবে, তাহলে তুচ্ছ ক্ষুদ্র হলেও বাদশাহ তা গ্রহণ করবেন, আমাদের প্রতি দয়াবান হবেন।

گفت زن صدق آن بود کز بود خویش
پاک برخیزی تو از محمود خویش
*গোফত যান সিদক আ'ন বুয়াদ কায বূদে খিশ*
*পা'ক বারখিযী তো আয মাজহুদে খিশ*
স্ত্রী বলল: সততা-নিষ্ঠার দাবি, এমন লক্ষে পৌছতে হলে
নিজের অস্তিত্ব দিয়ে গড়া শ্রমলব্ধ উৎসর্গ চাই তাহলে।

সততা মূলে সিদক। এখান থেকেই সিদ্দীক, সাদকাহ, সাদাকাত পরিভাষার উৎপত্তি। কুরআন মাজীদে সিদ্দীকীনদের সাহচর্য অবলম্বন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। সিদ্দীকীনদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, সততা যাদের চরিত্র ও স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে গেছে এবং যাদের কথা ও কাজ সততা থেকে উৎসারিত হয় তারাই সিদ্দীকীন, বাংলায় সত্যনিষ্ঠ। সততার পরিচয় সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, সততা হল, তুমি আসলে যা তোমাকে সেরূপই প্রকাশ করবে। আর তুমি নিজেকে যেরূপ দেখাও বাস্তবে সেরূপ হবে।[১]

যে ব্যক্তি নিজের কামনা-বাসনার সাথে মাখামাখি করবে সে কোনোদিনই সততার সুগন্ধ পাবে না। আর যে সততার সৌন্দর্য দেখেছে এবং নিজের কামনা-বাসনার বিরোধীতা করেছে, সে কখনো মৃত্যুকে ভয় পায় না; বরং সর্বদা জিবরাঈলের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। কুরআন মাজীদে এ কথাই বলা হয়েছে: فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ -তুমি যদি সত্যবাদী হও তো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর।[২]

সতাতার প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য বেদুইন মহিলা সরাসরি একটি প্রস্তাব দিল,

آب بارانست ما را در سبو
ملکت و سرمایه و اسباب تو
*আ'বে বা'রা'ন আস্ত মা'রা' দার সাবু*
*মিলকাতো সরমা'য়ে ও আসবা'বে তো*
আমাদের আছে বৃষ্টির পানি মশকের মধ্যে ভরা
তোমার ধন, পুঁজি, সম্পদ সম্বল সবকিছুই তা।

মরুভূমিতে সবচে দুর্লভ পানি। তাও বৃষ্টির পানি। বেদুইন ও তার স্ত্রী মিলে এক মশক পানি যোগাড় করেছিল খাবার জন্যে। মরু প্রান্তরের সবচে বড় সম্পদ। এর চেয়ে বড় সম্পদ, ধন ভাণ্ডার ও পুঁজি বলতে আর কিছুই ছিল না বেদুইন দম্পতির কাছে। স্ত্রীর কথা হলো, এই অমূল্য অমৃত সুধা পানি নিয়ে যাও বাগদাদে মহামান্য খলীফার দরবারে।

این سبوی آب را بردار و رو
هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو
*ইন সাবূয়ে আ'ব রা' বারদা'র ও রো*
*হাদিয়ে সা'য ও পীশে শাহানশা'হ শো*
পানির এ সুরাহী কাঁধে নাও তারপর রওনা কর
এই হাদিয়া শাহানশাহর দরবারে নযরানা পেশ কর।

گو که ما را غیر این اسباب نیست
در مفازه هیچ به زین آب نیست
*গূ কে মারা' গাইরে ইন আসবা'ব নীস্ত*
*দার মাফা'যে হীচ বেহ্ যিন আ'ব নীস্ত*
বলবে যে, আমাদের এ ছাড়া অন্য সম্বল নাই
মরুপ্রান্তরে পানির চেয়ে উত্তম কিছু পাই নাই।

বেদুইন স্ত্রী তার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাল, বাগদাদে মনিরত্ন অগাধ থাকতে পারে; কিন্তু এমন স্বচ্ছ সুপেয় বৃষ্টির পানি সেখানে নাই । কারণ, তার চোখে ও ধ্যানে জ্ঞানে তো মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নাই । তাই মনে করে মরুভূমির হাহাকার পুরো দুনিয়ায়।

گر خزینه‌ش پر زراست و گوهر است
این چنین آبش نیاید نادرست
*গার খাজিনাশ পুর যে যার ও গাওহার আস্ত*
*ইন চুনীন আ'বাশ নয়া'য়াদ না'দের আস্ত*
যদিও রাজার কোষাগার ভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য রত্ন-মণিতে
কিন্তু এমন স্বচ্ছ পানি অতি দুর্লভ, নাই বাগদাদে।

বাদশাহর কোষাগারে রত্নমানিক অনেক থাকতে পারে। কিন্তু পানির মত মহামূল্যবান অমৃত সেখানে নাই। বাদশাহর বিশাল রাজত্বের ব্যাপারে বেদুইন নারীর জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতাকে আল্লাহর মারিফাতের ব্যাপারে মানুষের জ্ঞানের দুর্বলতার সাথে তুলনা করেছেন মাওলানা রূমী। বলছেন, মানুষ এমনই ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। মাওলানা ঘটনা প্রবাহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন, স্ত্রী যে কলসি করে বাগদাদে খলীফার দরবারে পানি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল সেই কলসি আসলে কী?

چیست آن کوزه تن محصور ما
اندرو آب حواس شور ما
*চীস্ত অন কুযে তনে মাহসুরে মা*
*আন্দারো আ'বে হাওয়াসসে শূরে মা*

এই কলসি কি আমাদের সীমিত তুচ্ছ কায়া?
তার মাঝে আছে ইন্দ্রিয়ের নোংরা লবনাক্ততা।

মশক, সুরাহী কলসি বলতে কী বুঝাতে চেয়েছি। তা তো আমাদের সীমাবদ্ধ তুচ্ছ দেহকায়া। নিঃস্ব বেদুইনের কলসিতে যেমন সামান্য পানি ছাড়া কিছুই ছিল না; তাও আবার বালুচর হতে সংগ্রহ করা পানি, আমাদের সীমাবদ্ধ দেহেও কতক অপূর্ণ ভ্রান্তি-সর্বস্ব ইন্দ্রিয় ছাড়া কিছুই নেই, যা সত্যিকার কোনো কাজে আসতে পারে। এই দেহ আমাদের সামনে সত্যকে উদ্ভাসিত করতে ও মহাসত্যে উপনীত করতে পারে না। মাওলানার ধ্যানমন এ মুহূর্তে সবকিছু ছেড়ে উড়াল দিয়ে চলে গেল উর্ধ্বলোকে, মহান শাহানশাহর সন্নিধানে। মাওলানার অন্তর নিংড়ানো আর্তি তাই-

ای خداوند این خم و کوزۂ مرا
در پذیر از فضل اللہ اشتری
*আই খোদাওয়ান্দ ইন খুম ও কূযেয় মারা*
*দার পাযীর আয ফাযলে আল্লাহুশ তারা*
হে খোদা! মোদের এই সুরাহী ও কায়ার মটকা খানি
কবুল করে নাও,দাও 'আল্লাহুশ তারা'র দয়ার হাতছানি।

আল্লাহুশতারা 'আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন।" সূরা তাওবার একটি আয়াতের একটি অংশের উদ্ধৃতি টেনেছেন মাওলানা তাঁর আর্জিতে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ

-আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল একথার ওপর ক্রয় করে নিয়েছেন যে, বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে।[৩]

মুমিনের জানপ্রাণ আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত– এ কথা বুঝানোর জন্যেই রূপক হিসেবে ক্রয় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ আল্লাহর সাথে বান্দার ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক তো অসম্ভব, অকল্পনীয়। বেদুইনের ভাষায় মাওলানা বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের অবস্থা ও আমলসমূহের যে পানি আমাদের অস্তিত্বের মটকায় জমা করেছি, তা তোমার দয়া ও মেহেরবানী দিয়ে গ্রহণ কর। কুরআন মাজীদে মুমিনদের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নেয়ার যে ওয়াদা দিয়েছ, সেই দয়ার পরশ আমাদের দাও। আমাদের অস্তিত্বের যে মটকা বা কলসি, তার নল আছে পাঁচটি।

کوزہای با پنج لولۂ پنج حس
پاک دار این آب را از هر نجس
*কূযেয়ী বা' পাঞ্জ লুলেয় পাঞ্জ হেস*
*পা'ক দা'র ইন আ'ব রা' আয হার নাজেস*
আমাদের কলসির নল পাঁচটি, সেই পাঁচ ইন্দ্রিয়
রাখ এ পানি, সকল নাপাকি হতে পূতঃপবিত্র।

মানব দেহ কলসির মত, যার আছে পাঁচটি নলের মত পঞ্চেন্দ্রিয়। হে রব! আমাদের কলসিকে নাপাকি কলুষতার ছোঁয়া হতে রাখ পবিত্র।

পঞ্চেন্দ্রিয় স্বভাবত জৈবিক চাহিদা, কামনা-বাসনা ও ভোগ লিপ্সার আকর্ষণের আজ্ঞাবাহী। এই পথ দিয়ে মানুষের দেহ কাঠামোর অভ্যন্তরে, মনের কলসির ভেতরে এমন জিনিস প্রবেশ করে যা কলুষিত, দুষিত, কর্দমাক্ত। অন্যদিকে এই কলসি সীমাবদ্ধ হওয়াতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতের অতি সামান্যই তাতে স্থান পায়। কাজেই হে আল্লাহ! আমাদের অস্তিত্বের কলসিকে দূষণমুক্ত রাখ।

تا شود زین کوزہ منفذ سوی بحر
تا بگیرد کوزۂ من خوی بحر
*তা' শাওয়াদ যিন কূযে মানফায সূয়ে বাহর*
*তা' বেগীরাদ কূযেয়ে মান খোয়ে বাহর*
যাতে এই কলসির পানি বহমান হয় সাগর অভিমুখে
আমাদের কলসি যেন রূপ নেয় সাগরের স্বভাবে।

মানুষের অস্তিত্বের সুরাহী যখন খারাপ স্বভাব ও চরিত্র হতে পবিত্র হয়, তখন আল্লাহর মারেফতের সাগরের সাথে তা যুক্ত হয়, তখন দুনিয়ার কোনো বিষয়ই তাকে কলুষিত, দুর্গন্ধযুক্ত করতে পারে না।

تا چو هدیه پیش سلطانش بری
پاک بیند باشدش شه مشتری
*তা' চো হাদয়ে পীশে সুলতা'নাশ বারী*
*পা'ক বীনাদ বা'শাদাশ শাহ মুশতারী*
এই হাদিয়া নিয়ে যাবে যখন বাদশাহর সমীপে
পবিত্র দেখলে, হয়ত বাদশাহ স্বয়ং ক্রেতা হবে।

স্ত্রী বলল: পানি স্বচ্ছ পবিত্র দেখলে, অর্থাৎ আমাদের ভেতরটা পরিচ্ছন্ন নির্মল হলে বাদশাহ তা কবুল ও মঞ্জুর করে নিবেন।

بی نهایت گردد آبش بعد از آن
پر شود از کوزۂ من صد جهان
*বী নেহায়ত গার্দাদ আ'বাশ বা'দ আয আ'ন*
*পুর শাওয়াদ আয কূযেয়ে মান সাদ জাহা'ন*
সীমাহীন করে দিবেন এরপর তাতে পানির পরিমাণ
ভরে যাবে আমাদের কলসির পানিতে একশ জাহান।

মানুষের অস্তিত্বের কলসির সাথে যখন হাকীকতের সাগরের যোগাযোগ হয়ে যাবে তখন সাগর সংযোগে কলসির পানি অফুরান হয়ে যাবে। কেননা তা আল্লাহর অস্তিত্বের অনন্ত সাগরের সাথে যুক্ত হয়েছে, বিশ্বজনীন হয়েছে এবং সর্বত্র পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও প্রফুল্লতায় ভরে গেছে।

لولهها بر بند و پر دارش ز خم
گفت غضوا عن هوا ابصارکم
*লূলেহা' বার বান্দ ও পুর দা'রাশ যে খুম*
*গোফত গাদ্দু আন হাওয়া আবসারাকুম*
নলগুলো বন্ধ কর মারিফাতের কলসি হতে ভরে নাও
বলেছেন, কামনা আকর্ষণ হতে তোমাদের চোখ বন্ধ কর।

দেহের কলসিতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পথে দুনিয়াবী কামনা-বাসনার কলুষিত পানি যাতে ঢুকতে না পারে, সতর্ক জীবনযাপনের মাধ্যমে সে ব্যবস্থা নাও। এরপর আল্লাহর অস্তিত্বের সাগরের সাথে সে কলসির যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা কর, সর্বক্ষণ চিন্তা, কথা ও কর্মে আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহর অস্তিত্বের সাগরের ঢেউ এসে তোমার কলসি ভরপুর হয়ে যাবে। কুরআনে যে দৃষ্টিশক্তি সংযত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মূলে রয়েছে এই জীবনদর্শন।

ریش او پر باد کین هدیه کراست
لایق چون آن شهی اینست راست
*রীশে উ পুর বা'দ কিন হাদিয়ে কেরা'স্ত*
*লায়েকে চোন উ শাহী ঈনাস্ত রা'স্ত*
বেদুইন গর্বে ফুলে ঢোল এমন হাদিয়া আছে কার কপালে
এমন বাদশাহর যোগ্য উপঢৌকন এটিই তো হতে পারে।

স্ত্রীর মুখে বৃষ্টির পানির ফদীলত এবং বাদশাহর দরবারে তার সম্ভাব্য কদরের কথা চিন্তা করে স্বামী ফুলে একেবারে ঢোল। মনে মনে বলে, বাগদাদের বাদশাহর কাছে পেশ করার জন্য এর চেয়ে উত্তম উপঢৌকন কার আছে? কার কপালে জুটেছে এমন সৌভাগ্য। এমন মনোভাবের কারণ, তাদের ধারণা ছিল মরুভূমির তপ্ত বালুকার মতো বাগদাদেও পানির হাহাকার। তাদের জানা ছিল না বাগদাদে এরূপ কলসির পরিমান পানি লক্ষ কোটি গুণ বেশি প্রবাহমান।

زن نمی‌دانست کانجا برگذر
جوی جیحون است و شیرین چون شکر
*যান নমী দানিস্ত কা'নজা' বার গুযার*
*জুয়ে জায়হুন আস্ত শীরীন চোন শেকার*
স্ত্রী জানত না যে, বাগদাদে সড়কের পাশে
জায়হুন নদীর ঝর্ণা প্রবাহিত মধুর স্রোতে।

মাওলানা আশরফ আলী থানবীর কলীদে মসনবীতে নিচের ছত্রটি নিম্নরূপ-

هست جاری دجلهای همچون شکر
*হাস্ত জা'রী দাজলেয়ী হামচো শেকার*
বহমান দজলা বহে মধুর সুপেয় পানির স্রোতে।

در میان شهر چون دریا روان
پر ز کشتیها و شست ماهیان
*দারমিয়া'নে শাহর চোন দারয়া' রাওয়া'ন*
*পুর যে কেশতীহা' ও শাসতে মা'হিয়া'ন*
শহরের মাঝ দিয়ে দরিয়ার মত প্রবাহিত নদী
সাম্পান জাহাজ মাছ ও মাছ শিকারীতে ভর্তি।

মাওলানা বাগদাদ ও দজলার প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে এনে আমাদেরকে আল্লাহর অনন্ত রহস্য ঘেরা বিশ্ব ব্যবস্থাপনা অবলোকন ও জান্নাতে বন বীথিকার পাদদেশে প্রবাহিত নহরের ছবি মনে আঁকার তাগিদ দিয়ে বলেছেন:

رو بر سلطان و کار و بار بین
حس تجری تحتها الانهار بین
*রো বারে সুলতা'ন ও কা'রো বা'র বীন*
*হেস্‌সে তাজ্‌রী তাহতাহাল আনহা'র বীন*
যাও, রাজাধিরাজের কাছে দেখ তার বিশ্বব্যবস্থা কেমন
বীথিকার তলে নদীর প্রবাহ দেখ ফেরদৌসের কানন।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

আল্লাহ পাক বলেন, তোমাদের কেউ কি ভালোবাসে যে, তার জন্য এমন এক বাগান হবে, যেখানে থাকবে খর্জুর বীথিকা ও আঙ্গুর-যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত?[৪]

این چنین حسها و ادراکات ما
قطرهای باشد در آن نهر صفا
*ইন চুনীন হেসহা' ও এদরা'কা'তে মা*
*কাতরেঈ বা'শাদ দার আ'ন নাহরে সাফা*
আমাদের ইন্দ্রিয়, উপলব্ধি ও অনুভূতি সবটাই
এক বিন্দুর সমতুল্য সেই স্বচ্ছতার দরিয়ায়।

মাওলানা বলছেন, খোদায়ী জ্ঞান কাননের প্রবাহিত স্বচ্ছ ঝর্ণা ও নহরসমূহের সাথে তুলনা করলে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, উপলব্ধি ও সঞ্চয়গুলো একবিন্দু পরিমাণও হবে না। ◻

[১] মানাকিবুস সুফিয়া, পৃ.৭৫
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-৯৪
[৩] সূরা তাওবা: আয়াত-১১১
[৪] সূরা বাকারা: আয়াত-২৬৬


মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর
Al Arab Tailors
আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট
১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট
01734-346601



# এই মাসে এই চাঁদে

**পরওয়ানা ডেস্ক:**

আল্লাহ ও রাসূলপ্রেমিক মুমিনের জন্য কারবালার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। হিজরী বর্ষপরিক্রমার প্রথম মাস মহররম। এ মাসের ১০ তারিখ মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের ৫০ বছর পর ৬১ হিজরীতে সংঘটিত হয় এ মর্মান্তিক ঘটনা। এ দিনে মহানবী ﷺ-এর প্রিয় নাতি ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবার এবং বংশের ৭২ জন নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন।

**১০ মহররমে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি**

১. মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টি, তাঁর জান্নাতে অবস্থান, পৃথিবীতে প্রেরণ ও তাওবা কবূল সবই ১০ মহররম সংঘটিত হয়।

২. হযরত নূহ (আ.) এর নৌকা ৪০ দিন পর জুদি পাহাড়ের পাদদেশে মাটি স্পর্শ করে ঐতিহাসিক ১০ মহররমে।

৩. এ দিনেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, তাঁকে 'খলীলুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং নমরুদের অগ্নি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

৪. হযরত ইদরীস (আ.) কে বিশেষ মর্যাদায় চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয় এ দিনে।

৫. দীর্ঘ ৪০ বছর পর হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে তার পিতা ইয়াকুব (আ.) এর সাক্ষাৎ হয়।

৬. হযরত আইয়ুব (আ.) দীর্ঘ ১৮ বছর কুষ্ঠরোগ ভোগ করার পর আরোগ্য লাভ করেছিলেন এ দিনে।

৭. ইউনুস (আ.) ৪০ দিন মাছের পেটে থাকার পর মুক্তিলাভ করেন এ দিনে।

৮. হযরত সুলাইমান (আ.) সাময়িক রাজত্বহারা হন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আবার রাজত্ব ফিরিয়ে দেন এ দিনে।

৯. আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারী বনী ইসরাইলদের ফিরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে পানির মধ্যে রাস্তা তৈরি করে দিয়ে পার করে দেন এবং ফিরআউনকে তার দলবলসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারেন এ দিনে। হযরত মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন ১০ মহররমে।

১০. এ দিনে হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম হয় এবং ইয়াহুদীরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফিরিশতা কর্তৃক সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন এ দিনেই।

১১. আশুরার দিবসেই মহানবী ﷺ এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

১২. পবিত্র কাবা শরীফে সর্বপ্রথম গিলাফ দিয়ে আবৃত করা হয়েছিল এ দিনে।

১৩. আশুরার দিনেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ, মর্তজগৎ, পর্বতরাজি, লওহ-কলম ও ফিরিশতাদের।

১৪. আকাশ থেকে প্রথম বৃষ্টিপাত হয় এ দিনেই।

১৫. কিয়ামত সংঘটিত হবে মহররম মাসের ১০ তারিখ জুমুআবার।

১৬. এ দিনে সপরিবারে শহীদ হন বিশ্বনবী ﷺ এর প্রিয় নাতি ইমাম হুসাইন (রা.)।

**নবী পরিবারের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার**

ইসলামী সেনার সংখ্যা ৭২ থেকে ১১০ জনের মধ্যে কয়েকজন ছিল নওজোয়ান, বাকিরা বৃদ্ধ, শিশু ও নারী। তাঁরা একে একে ময়দানে অবতীর্ণ হন। আর বীর বিক্রমে লড়াই করে অসংখ্য শত্রুকে জমালয়ে পাঠিয়ে দেন। অবশেষে নিজেরাও শাহাদাতবরণ করেন। ইয়াযীদ বাহিনী কারবালার ফোরাত নদীর পানি দখল করে রাখে, যাতে ক্ষুধা ও পিপাসায় ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর স্ত্রী-সন্তান এবং সাথিরা কষ্ট পায়। যুদ্ধ চলাকালে তাঁবু থেকে শিশুর ক্রন্দন শুনে ইমাম ফিরে এসে দেখলেন ছয় মাসের দুগ্ধপোষ্য আলী আসগর তীব্র পিপাসায় ও ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছেন । তিনি শিশুপুত্রকে হাতে তুলে নিয়ে শত্রুদের একটু পানি দিতে বললেন। এ সুযোগে ইয়াযীদের সেনাপতি ওমর বিন সাদের নির্দেশে হুরমুলা নামের পাষণ্ড তির ছোড়ে, শিশু আসগরের গর্দান পিতা হুসাইনের বাহু ভেদ করে তিরটি বেরিয়ে যায়। শিশু আসগর পিতার কোলেই শহীদ হন। দুশমনরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকে তির, বল্লম, নেজা ইত্যাদি। অবশেষে অসংখ্য আঘাত ও জখমপ্রাপ্ত হয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) অশ্বপৃষ্ঠ থেকে যমীনে পড়ে যান। পাষণ্ড সীমার এসে ইমামের মস্তক মুবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পবিত্র আহলে বাইতের তাঁবু লুণ্ঠিত হয়। দলিত, মথিত করা হলো শহীদের লাশ । আর এভাবেই ইয়াযীদ বাহিনী হযরত ইমাম হুসাইনের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও ক্ষুদ্রসংখ্যক ইসলামী বাহিনীকে ঘেরাও করে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর কাছে যা ছিল সবই খুলে ফেলা হয়। এমনকি তাঁর লাশ থেকে কাপড়ও খুলে ফেলা হয়। পরে তাঁকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ করা হয়, মহিলাদের গায়ের চাদরও ছিনিয়ে নেয়া হয়। হযরত হুসাইন (রা.) ও অন্য শহীদদের পবিত্র মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কুফায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রকাশ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

# জীবন জিজ্ঞাসা

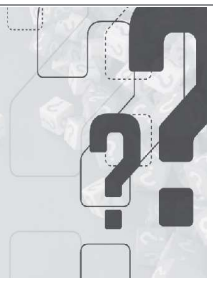


**জবাব দিচ্ছেন-**

**মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার**

প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার

মিশিগান, আমেরিকা


**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**

**প্রশ্ন: হজ্জের সময় আরাফাহ, মুযদালিফা বা মীনায় কখনো স্যুপ কিংবা ফ্যাসিয়্যাল টিস্যু সরবরাহ করা হয় যেগুলোতে সুগন্ধি থাকে। ইহরামে থাকাকালীন সময়ে এগুলোর ব্যবহারে কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?**

জবাব: ইহরামে থাকাবস্থায় কোন হজ্জ পালনকারী কিংবা ওমরাহ আদায়কারী যেকোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করা অপরিহার্য। সুতরাং এমতাবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত কোনো টিস্যু কিংবা স্যুপ (সাবান) ব্যবহার তদ্রুপ নিষিদ্ধ। যেহেতু তা ইহরামের মহান উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত স্যুপ কিংবা ফ্যাসিয়্যাল টিস্যু ব্যবহার সর্বতোভাবে পরিহার করে চলা উচিত। উল্লেখ্য যে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারে দম আবশ্যক হয়। এ সম্পর্কে আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

قَالَ: (وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخَطْمِيِّ، وَلَا يَدَّهِنُ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِزَالَةَ الشَّعْثِ .

(আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৫)

এ প্রসঙ্গে আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন-

(قَوْلُهُ وَغُسْلَهُمَا بِالْخَطْمِيِّ) أَيْ وَلْيَجْتَنِبْ غَسْلَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِالْخَطْمِيِّ وَاللِّحْيَةُ لَمَّا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ وَوُجُوبُ اجْتِنَابِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ إذَا لَمْ يَجْتَنِبْهُ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ طِيبٍ وَعِنْدَهُمَا صَدَقَةٌ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ وَيُلَيِّنُ الشَّعْرَ، وَلَيْسَ بِطِيبٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ رَاجِعٌ إلَى تَفْسِيرِهِ،..... (قَوْلُهُ وَمَسَّ الطِّيبِ) أَيْ وَاجْتَنِبْهُ مُطْلَقًا فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ

(আল বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৯)

**শামীম আহমদ**

লংআইল্যান্ড, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

**প্রশ্ন: কেউ যদি হজ্জে গিয়ে যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখের পর (১৩ তারিখের) মধ্যরাত পর্যন্ত মীনায় অবস্থান করে মক্কায় ফিরে আসে, তার জন্য ১৩ যিলহজ্জ তারিখে জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা লাগবে কি?**

জবাব: যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত মীনায় অবস্থান করা সুন্নাত এবং ১০, ১১ ও ১২ তারিখের কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। ১৩ তারিখ অবস্থান করা উত্তম এবং ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত মীনার সীমানায় অবস্থান করলে ঐ দিনের কংকর নিক্ষেপ শরীআতের বিধান অনুযায়ী ওয়াজিব হিসেবে পরিগণিত হবে। মধ্যরাতে কিংবা সুবহে সাদিকের পূর্বে যেকোনো সময়ে মীনার সীমানা থেকে বের হয়ে আসলে ঐ দিনের (১৩ তারিখের) কংকর নিক্ষেপ আবশ্যক হবে না। এ সম্পর্কে তুহফাতুল ফুকাহা কিতাবে লিখেছেন-

وَإِذَا أَرَادَ أَن ينفر وَيدخل مَكَّة نفر قبل غرُوب الشَّمْس فَإِن لم ينفر حَتَّى غربت الشَّمْس فَإِن الْأَفْضَل لَهُ أَن لَا ينفر حَتَّى يَرْمِي الْجِمَار الثَّلَاث من الْغَد ولَو نفر قبل طُلُوع الْفجْر من الْيَوْم الرَّابِع فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقد أَسَاءَ

(তুহফাতুল ফুকাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৯)

মুলতাকাল আবহুর কিতাবে লিখেছেন-

ثمَّ إِن شَاءَ نفر إِلَى مَكَّة وَله ذَلِك قبل طُلُوع فجر الْيَوْم الرَّابِع لَا بعده حَتَّى يَرْمِي

(মুলতাকাল আবহুর, পৃষ্ঠা-৪১৬)

শরহুল বেকায়াহ কিতাবে এ বিষয়ে লিখেছেন-

وله النَّفْر قبلَ طلوعِ فجرِ اليومِ الرَّابعِ: النَّفرُ خروجُ الحاجّ من مِنى، (لا بعدَه): فإنَّهُ إن توقَّفَ حتَّى طلعَ الفجرُ وَجَبَ عليه رميُ الجِمَار.

(শরহুল বেকায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৬)

**আলী আশরাফ**

ষ্টারলিং হাইটস, মিশিগান, ইউএসএ

**প্রশ্ন-১: উযুর মধ্যে ঘাড় মাসেহ করার বিধান কী? জানতে চাই।**

**প্রশ্ন-২: নামাযরত কারো সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার বিধান কী?**

জবাব-১: উযুর মধ্যে মাথা মাসেহের পাশাপাশি গর্দান (ঘাড়) মাসেহ করা অধিকাংশ ফকীহগণের মতানুযায়ী মুস্তাহাব।

এ সম্পর্কে আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ কিতাবে লিখেছেন-

وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ قِيلَ سُنَّةٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ، وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ اخْتِيَارُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ، وَيَمْسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ. وَفِي النِّهَايَةِ يَمْسَحُهُمَا بِظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ

আর ঘাড় মাসেহ করা- কারো মতে সুন্নাত, ইমাম তাহাবী এ মতের প্রবক্তা। আবার কেউ কেউ তা মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন, যেমন আস সদরুশ শহীদ (র.) এ মতের প্রবক্তা। নতুন পানি দ্বারা ঘাড়ের দু'পার্শ মাসেহ করা বাঞ্চনীয়। নেহায়াহ গ্রন্থে লিখেছেন- হাতলীর পিট দ্বারা ঘাড় মাসেহ করা হবে। (আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬)

এ সম্পর্কে ফাতহুল কাদীর কিতাবে লিখেছেন-

وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ بِظَهْرِ الْيَدَيْنِ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِ بِلَتِّهِمَا،

-হাতের তালুর পিট দ্বারা ঘাড় মাসেহ মুস্তাহাব। যেহেতু তা ব্যতীত হাতের তালুর পিট ভেজা অবস্থায় অব্যবহৃত থেকে যায়। (ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬)

খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে এ সম্পর্কে লিখেছেন-

ومسحُ الرقبة الأصحُّ أنّه أدبٌ وفعلُه أولى من تركه

-ঘাড় মাসেহ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে- তা মুস্তাহাব। না করার চেয়ে করাই উত্তম। (খাযানাতুল মুফতীন, পৃষ্ঠা-৭২)

জবাব-২: নামাযরত কারো সম্মুখ দিয়ে সরাসরি অতিক্রম করা শরীআতের দৃষ্টিতে মারাত্মক মাকরূহ তথা অতি অপছন্দনীয়। যেহেতু এ সম্পর্কে হাদীস শরীফের একাধিক বর্ণনায় শক্ত নিষেধাজ্ঞা বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে-

عن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

-হযরত বুসর ইবন সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত যে, যায়িদ ইবন খালিদ (রা.) তাঁকে আবূ জুহাইম (রা.)-এর নিকট পাঠালেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে কী শুনেছেন। তখন আবূ জুহাইম (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন নাযর (র.) বলেন, আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫১০)

সুপ্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ বাদাইয়ুস সানাঈ কিতাবে এ বিষয়ে লিখেছেন-

وَيُكْرَهُ لِلْمَارِّ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْرِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، وَلَمْ يُوَقِّتْ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ قَدْرَ الْمُرُورِ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِقْدَارُ الصَّفَّيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ مَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى الْمَارِّ لَوْ صَلَّى بِخُشُوعٍ، وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ،

-রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীসে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমের নিষেধাজ্ঞার কারণে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়। আর অতিক্রম করার নিষিদ্ধতার সীমা উল্লেখ না হওয়াতে মনিষীগণ এ সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষিদ্ধতার সীমা হচ্ছে- নামাযীর সিজদার স্থান পর্যন্ত জায়গা, আবার কেউ বলেছেন, সম্মুখস্থ দুটি কাতারের সমপরিমাণ জায়গা। আবার কেউ বলেছেন, একাগ্রতার সাথে কেউ নামাযে দাঁড়ালে অতিক্রমকারীর দিকে যেটুকু দুরত্বে দৃষ্টি নিপতিত হবে এমন পরিমাণ স্থান এর আওতাভুক্ত হবে । আর এর বাইরের স্থান দিয়ে অতিক্রম নিষিদ্ধ নয়। আর এ শেষোক্ত অভিমতই অধিক বিশুদ্ধ। (বাদাইয়ুস সানাঈ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)

সুতরাং নামাযরত যেকোনো ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে নিকটবর্তী স্থান দিয়ে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করা থেকে বিরত থেকে তার নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কিংবা তার সম্মুখে কোনো সুতরাহ (আড়াল) স্থাপন করে অতিক্রম করা বাঞ্চনীয়।

**বরকত উল্লাহ**
গাজীপুর, ঢাকা

**প্রশ্ন: কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কেউ মসজিদে ৫০০ টাকার শিরনী বণ্টন করবে বলে মান্নত করলে সে শিরনী কি ধনী-গরীব সকল মুসল্লী খেতে পারবে?**

জবাব: মান্নত এর আরবী শব্দ হলো- النذر (নাযর)। নযর বা মান্নত হচ্ছে-কোনো কাজকে নিজের ওপর আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পাদন করাকে ওয়াজিব করে নেওয়া। মান্নত একটি ঐচ্ছিক বিষয়। কিন্তু মান্নত করার পর শর্ত পাওয়া গেলে মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। ওজর ব্যতীত তা পূরণ না করা কবীরা গুনাহ।

মহান আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন- وَلْيُوَفُّوا نُذُورَهُمْ. -এবং তারা যেন তাদের মান্নত পুরো করে। (সূরা হজ্জ, আয়াত-২৯)

উপরন্তু মান্নত পুর্ণ করাকে জান্নাতীদের গুণ হিসাবে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- يوفون بالنذر -তারা (জান্নাতবাসীগণ) মান্নত পূর্ণ করতে অভ্যস্ত। (সূরা ইনসান, আয়াত-৭)

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

-যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করল, সে যেন মান্নত পূর্ণ করে। আর যে কোনো গুনাহের মান্নত করলো, সে যেন তা না করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৬৯৬)

মান্নত সহীহ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

১) কাজটি হালাল হওয়া। হারাম কাজের মান্নত করলে তা সহীহ নয়। বরং সেটা বর্জন করা জরুরি। যেমন, কাউকে হত্যা করা বা কারও সাথে যেনা করার মান্নত করলো।

২) মান্নত আল্লাহর নামে হওয়া। কোনো মাখলুকের নামে মান্নত করলে তা সহীহ নয়। বরং গোনাহ বা শিরক হতে পারে।

৩) মান্নতের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা। শুধু মনের নিয়তের দ্বারা মান্নত ওয়াজিব হয় না।

৪) মান্নত এমন কোনো ইবাদতের হওয়া, যার মতো কাজ শরীআতে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং সেটি শরীআতের মৌলিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ-ওমরাহ, দান-সাদাকাহ ইত্যাদি।

মান্নত যেমন শর্তযুক্ত হতে পারে, তেমনি শর্তহীন হতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ, যেমন কেউ বলল, আমার যদি রোগ ভালো হয়ে যায়, আমি আল্লাহর জন্য একটি বকরি সাদাকাহ করবো।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ, আমি আল্লাহর জন্য একটি ছাগল সাদাকাহ করার মান্নত করলাম।

শর্তহীন মান্নত সাথে সাথে ওয়াজিব হয়ে যায়। আর শর্তযুক্ত মান্নত আশাটি পূরণ হওয়ার পর আদায় করা ওয়াজিব। এর আগে নয়।

তুহফাতুল ফুকাহা গ্রন্থে মান্নতের বিধান প্রসঙ্গে লিখেছেন-

إذا نذر لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا هُوَ قربَة وَطَاعَة يجب عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ وَلم يجب عَلَيْهِ غير ذَلِك وَإِن كَانَ مُبَاحا لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ مَعْصِيّة لم يجب عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ وَعَلِيهِ كَفَّارَة الْيَمين إِذا فعله وَأَصله قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من نذر نذرا أَن يُطِيع الله فليطعه وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام النّذر يَمِين وكفارته كَفَّارَة يَمِين

(তুহফাতুল ফুকাহা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৯)

মান্নত তাকদীরের কোনো বিষয় পরিবর্তন করতে পারে না। এটি স্বাভাবিক আসবারের মতোই। যেমন সুস্থতার জন্য ওষুধ খাওয়া, রুজির জন্য যে কোন পেশা অবলম্বন করা। এ প্রসঙ্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

-মান্নত কোনো বিষয়কে এগিয়ে আনতে পারে, কোনো জিনিসকে টলাতে পারে না। কেবল কৃপণ থেকে কিছু অর্থ বের করে আনে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬৩৯)

এজন্য মান্নতের চাইতে সাদাকাহ উত্তম। এবং সাদাকাহর সাওয়াব ও শক্তি অনেক বেশি। যদিও সাদাকাহ করা সুন্নাত, আর কৃত মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, শরীআতমতে মান্নতের সাথে মসজিদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি ব্যাপক বিষয়। কিন্তু দেশ- বিদেশের কোথাও কোথাও মসজিদের জন্য মান্নত করার ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। তাই প্রশ্নোল্লেখিত মসজিদে মান্নত সংক্রান্ত বিষয়রে পরিস্কার নিস্পতির জন্যে জরুরি মাসআলা মূলনীতিসহ উপস্থাপন প্রয়োজন।

শর্তযুক্ত মান্নতের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি মূলনীতি হচ্ছে-

এক. কোনো ব্যক্তি নামায, রোযা, হজ্জ, সাদাকাহ ইত্যাদি ইবাদতের মান্নত করার ক্ষেত্রে যদি কোনো স্থান, সময়, মুদ্রা, বা ব্যক্তি নির্ধারণ করে- তাহলে মূল ইবাদতটির মান্নত সহীহ হবে। ব্যক্তি, স্থান, সময় নির্ধারণ সহীহ নয়। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি, অর্থ, স্থান বা সময়ে কাজটি করা জরুরি নয়।

দুই. মান্নতের অর্থ ও বস্তুসামগ্রী ব্যয়ের খাত ঠিক যাকাত ফিতরার ব্যয়ের খাতের ন্যায়; অর্থাৎ গরীব মিসকীন। ধনীরা মান্নতের জিনিস খেতে পারবে না। সুতরাং কেউ যদি শুক্রবারে দান করার মান্নত করে, অথবা রোযা রাখার মান্নত করে; সেটা শুক্রবারে পুরো করা জরুরি নয়। বরং সপ্তাহের যেকোনো দিন পুরো করলেও সহীহ হয়ে যাবে। আবার যদি কেউ যায়িদ মিয়াকে কোনো জিনিস দেওয়ার মান্নত করে, সেটা খালিদ মিয়াকে দান করলেও আদায় হয়ে যাবে, যদি সে মান্নত খাওয়ার উপযুক্ত হয়। অনুরূপ কেউ যদি নির্দিষ্ট নোট বা অলঙ্কার দেওয়ার মান্নত করে, কিন্তু পরে অন্য নোট দিয়ে তা আদায় করে; মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে।

কেউ যদি মসজিদের জন্য বিস্কুট, জিলাপী, শিরনী বিতরণের মান্নত করে, যা সাধারণত আমাদের দেশে করা হয়ে থাকে; এটি মসজিদের জন্য মান্নত বলে গণ্য হবে না। বরং মসজিদের মুসল্লীদের জন্য মান্নত বলে গণ্য হবে। মসজিদের উল্লেখ এখানে গৌণ ধরা হবে। আর ওয়াজিব মান্নত ব্যয়ের খাত হলো গরীব মিসকীন তথা যাকাতের খাতসমূহ। সুতরাং মসজিদে বিতরণকৃত মান্নতের জিলাপী, শিরনী, বিস্কুট ধনী মুসুল্লীরা খেতে পারবে না; যাদের জন্য যাকাত খাওয়া জায়িয নয়।

মোটকথা, নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত মান্নতের বিধান হচ্ছে তা পূর্ণ হলে মান্নতকৃত বিষয় পূর্ণ করা আবশ্যক হবে, অন্যথায় নয়। আর সে মান্নতকৃত বিষয় কেবল (যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত) দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা খেতে পারবেন। ধনীদের জন্য তা খাওয়া জায়িয নয়। যেমন কেউ এ বলে মান্নত করল যে, আমি সুস্থতা লাভ করলে মসজিদের মুসল্লীগণকে ৫০০ টাকার শিরনী (বিরিয়ানী) খাওয়াব। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মান্নতকারী ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করলে তার পক্ষে মান্নত পূর্ণ করা আবশ্যক হবে এবং উক্ত মান্নতের শিরনী কেবল দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা খেতে পারবেন।

## অভ্যন্তরীণ

# পাস হলো নতুন অর্থবছরের বাজেট

সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার শিরোনামে ৬ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট পাশ হয়েছে। দেশের ৫৩তম এ বাজেট বড় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই পাস হলো। গত ৩০ জুন, জাতীয় সংসদে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে এ বাজেট পাস হয়। গত ৬ জুন জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত এ বাজেটে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত কর থাকছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। আর কর ব্যতীত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৬ হাজার কোটি টাকা।

বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৫.৯২ শতাংশ; এর মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৯২৮ কোটি টাকা। ভৌত অবকাঠামো খাতে ২ লাখ ১৬ হাজার ১১১ কোটি টাকা বা ২৭.১২ শতাংশ; যার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৯৫ হাজার ২৮৩ কোটি; যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ৮০ হাজার ৪৯৮ কোটি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৩০ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা। সাধারণ সেবা খাতে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭০১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২১.১৭ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৮৩ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০.৪৮ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫শ' কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১৪.২৪ শতাংশ; নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয় খাতে ৮ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১.০৮ শতাংশ। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা, যোগাযোগ অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, কৃষি, মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

# সারা দেশে 'বাংলা ব্লকেড' ঘোষণা: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের হিড়িক

রাজধানীর শাহবাগ মোড় ছেড়ে চলে গেছেন কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। শাহবাগ ছাড়ার আগে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এর সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। নতুন কর্মসূচি ঘোষণায় তিনি বলেন, আগামী ৬ জুলাই, বিকেল তিনটা থেকে বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো। শাহবাগ, নীলক্ষেত, সায়েন্সল্যাব, চানখারপুল, মতিঝিলসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ব্লক করা হবে।

সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে ২০১৮ সালে দেওয়া পরিপত্র বহাল রাখার দাবিতে দেশের বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

কোটা আন্দোলনকারী নেতাদের দেওয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সারা দেশের শিক্ষার্থীরা। যার যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেসবুক গ্রুপ ও পেজ থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরতে নারাজ। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রুপ ও ফেসবুক পোস্টে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

চলমান 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'র সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে তারা ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ডাক দিয়েছেন।

জাবি, জবি, রাবি, চবি, ইবিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকেও ক্লাস বর্জনের ঘোষণা এসেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৬টি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা করেছেন । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি বিভাগে ক্লাস বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি ব্যাচ ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে।

# পবিত্র আশুরা ১৭ জুলাই

আগামী ৮জুলাই, সোমবার শুরু হচ্ছে মহররম মাস ও নতুন আরবী বছর ১৪৪৬ হিজরী। সে অনুযায়ী, আগামী ১৭ জুলাই (১০ মহররম) দেশে পবিত্র আশুরা পালিত হবে। গত ৬ জুলাই, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিজরী সালের প্রথম মাস হচ্ছে মহররম। আশুরার দিন দেশে নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি থাকে। কারবালা প্রান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদতবরণের শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূলত আমাদের দেশে আশুরা উদযাপিত হয়।

# বন্যায় ১৫টি জেলার ২০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো: মহিবুর রহমান বলেছেন,'উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যায় ১৫টি জেলার প্রায় ২০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন,আগামী আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসেও এরকম আরেকবার বন্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগামী বন্যার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি। এছাড়া প্রতিদিনই বন্যা বিস্তৃতি লাভ করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, রংপুর, জামালপুর, গাইবান্ধা, ফেনী, রাঙ্গামাটি, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট ও কক্সবাজার জেলা বন্যাকবলিত হয়েছে। বন্যাকবলিত ১৫ জেলায় এ পর্যন্ত নগদ ৩ কোটি ১০ লাখ টাকা, ৮ হাজার ৭০০ টন ত্রাণের চাল, ৫৮ হাজার ৫০০ বস্তা শুকনো ও অন্যান্য খাবার, শিশু খাদ্য কেনার জন্য ৬০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য কেনার জন্য ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।'

# রাসেলস ভাইপার নিয়ে উভয় সংকট, ছড়াচ্ছে জেলায় জেলায়

রাসেলস ভাইপার-বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় আতঙ্কের নাম হয়ে উঠেছে বিষধর এই সাপ। বাংলায় সাপটির নাম চন্দ্রবোড়া, তবে দেশের মানুষ বেশি চেনে ইংরেজি নামটি। এক সময় বিলুপ্ত ঘোষণা করা প্রাণীটি উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। তবে এখন পদ্মা অববাহিকা ধরে ছড়িয়ে গেছে দেশের ২৬ থেকে ২৭টি জেলায় এবং সংখ্যাটা বেড়েই চলছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারাচ্ছে কৃষক বা কৃষি শ্রমিক। এর প্রতিক্রিয়ায় ফসলের মাঠে বা নদীর কিনারায় একের পর এক ছোবলের পর মানুষ দেখা মাত্রই সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। কিন্তু সাপের জাতটি সংরক্ষিত। ফলে নিধন করা আইনে নিষেধ, আতবে যেভাবে ছোবলের ঘটনা ঘটছে, তাতে উৎকণ্ঠিত মানুষের এই প্রতিক্রিয়াও অস্বাভাবিক নয়, সেটি বিবেচনায় নিয়ে নতুন করে ভাবছে বন বিভাগ;কাজ করছে তাদের বিশেষজ্ঞ দলও। সাপগুলো বেশি দেখা যাচ্ছে ফসলের মাঠে। কারণ তাদের প্রধান খাবার হল ইঁদুর, যেটি আবার ফসলের প্রধান শত্রু। অর্থাৎ একদিক দিয়ে এ সাপ কৃষকের বন্ধু,আবার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সাপ নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা অভয় দিচ্ছেন যে এ সাপ নিজে থেকে আক্রমণাত্মক না; এটি দেশের সবচেয়ে

বেশি বিষধরও না। তারা বলছেন, এটি ছোবল দেয় আতঙ্কিত হলে। এর আগে আবার সতর্ক করে শব্দ করে। কাজেই সতর্ক-সচেতন থাকলে ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন কিছু নয়।

## হজ্জ শেষে দেশে ফিরেছেন ৫১ হাজার ৯৮১ জন

পবিত্র হজ্জ পালন শেষে এখন পর্যন্ত ৫১ হাজার ৯৮১ জন হাজি দেশে ফিরেছেন। এ ছাড়া চলতি বছর ৬০ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালের সর্বশেষ বুলেটিনে এই তথ্য জানানো হয়। বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী, মারা যাওয়া ৬০ জনের মধ্যে ৪৭ জন পুরুষ এবং ১৩ জন নারী। এর মধ্যে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে ১৭ জন, বাকি ৪৩ জন হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর পর মারা গেছেন। সবার নাম-পরিচয় প্রকাশ করেছে হজ পোর্টাল। এসব হজযাত্রীর মধ্যে ৪৭ জন মক্কায় মারা গেছেন। মসজিদুল হারামে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া হজ পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে মদিনায় চারজন, মিনায় সাতজন ও জেদ্দায় দুজন মারা গেছেন।

# আন্তর্জাতিক

## বিশ্ব রাজনীতি ও ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট

ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ছিল তিক্ততায় ভরা। গত ৯ মে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইবরাহীম রাইসী। বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে অস্থির ইরানে প্রেসিডেন্টের মৃত্যু অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হয়ে আসে। রাইসীর মৃত্যুর পর ইরানের সর্বময় ক্ষমতাকেন্দ্রের ব্যক্তিদের জন্য 'অনুগত' ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে মাসুদ পেজেশকিয়ানের মতো মধ্যপন্থী সংস্কারবাদীকে নির্বাচনে লড়ার সুযোগ করে দিতে হয়। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী নিজেও পেজেশকিয়ানকে প্রার্থী হিসেবে চাননি। সে কারণেই ক্ষোভ দেখিয়ে হয়তো প্রথম দফার ভোটে অনেক ইরানী ভোট দিতে যাননি। তবে দ্বিতীয় দফায় পেজেশকিয়ান এগিয়ে থেকে লড়াই করার সুযোগ পাওয়ার পর ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। প্রথম দফায় যেখানে ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়লেও দ্বিতীয় দফায় পড়েছে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। পেজেশকিয়ান জিতলেও সরকার পরিচালনা অতটা সহজ হবে না। কারণ, ইরান সরকার এখনো রক্ষণশীলদের দিয়ে ভর্তি।

## হামাস-হিযবুল্লাহর গোপন বৈঠক

হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতা হাসান নাসরাল্লাহ এবং হামাসের রাজনৈতিক শাখার জ্যেষ্ঠ নেতা খলিল আল হায়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গাযায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত নিজেদের প্রস্তাব হামাস উপস্থাপন করেছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে লেবাননভিত্তিক শিআপন্থি সশস্ত্র ইসলামী গোষ্ঠী হিযবুল্লাহর কেন্দ্রীয় কমান্ড। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ে মত বিনিময় করেছেন উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদল। ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শান্তি সংলাপ এবং গাযার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে। গাযায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরুর এক মাস পর থেকে লেবানন-ইসরায়েল সীমান্ত থেকে ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট ছোড়া শুরু করে হিযবুল্লাহ। পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীও (আইডিএফ)। দিন যত গড়াচ্ছে, ততই তীব্র হয়ে উঠছে উভয়পক্ষের হামলা-পাল্টা হামলা।

## ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আহ্বান সৌদি আরবের

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকায় ইসরায়েল যে গণহত্যা ও আগ্রাসন চালাচ্ছে সে বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ বলেছেন, গাযার এই হত্যাযজ্ঞ দক্ষিণ লেবাননসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে। গাযায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের দায়ে তিনি ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও আহ্বান জানিয়েছেন। সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গাযা পরিস্থিতি শুধুতো ফিলিস্তিনি ইস্যুর ওপর প্রভাব ফেলছে না বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং ক্রমেই তা চলমান সংঘাত বাড়িয়ে তুলছে যার ফলাফল আমরা দেখছি দক্ষিণ লেবাননে। গত ০৫ জুলাই, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সুত্র: পার্স টুডে

## যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন কিয়ার স্টারমার

যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনে নিরাঙ্কুশ জয় পেয়েছে কিয়ার স্টারমারের দল লেবার পার্টি। তাই তাকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস। নির্বাচনে জয়ের পর বাকিংহাম প্রাসাদে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যান কিয়ার স্টারমার। সেখানেই তিনি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। গত ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেবার পার্টি ৬৫০ আসনের মধ্যে ৪১২টি আসনে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ১২১টি আসন। দেশটির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোনো দলের প্রয়োজন হয় ৩২৬ আসন। এদিকে নির্বাচনে ভারডুবিতে টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ঋষি সুনাক। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর কিয়ার স্টারমার তার ভাষণে বলেন, জনগণ সুচিন্তিতভাবে পরিবর্তন এবং জনগণের সেবামূলক রাজনীতির জন্য ভোট দিয়েছে। তবে কোনো দেশকে পরিবর্তন করা সুইচ টেপার মতো বিষয় নয়। এর জন্য সময় প্রয়োজন হবে। তবে পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করা হবে। তিনি বলেন, 'আমার মতো খেটে খাওয়া পরিবারগুলো যাতে জীবন চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' সুত্র: বিবিসি

## গাযায় ইসরায়েলি হামলায় ৫ সাংবাদিক নিহত

গাযায় ইসরায়েলি হামলায় ২৯ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন সাংবাদিক। গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে । নতুন পাঁচজনসহ এখন পর্যন্ত ১৫৮ জন সাংবাদিক ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি অপরাধ যাতে প্রকাশ না পায়, সেজন্য ফিলিস্তিনী সাংবাদিকদের টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে ইয়াহুদী সেনারা। ১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক হত্যার তথ্য নথিভুক্ত করে আসছে নিউইয়র্কভিত্তিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট'। সংস্থাটি জানিয়েছে, ওই সময় থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সংঘাত হয়েছে, গাযার যুদ্ধ ছিল সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। সুত্র: আলজাযিরা

## ইসরায়েলি বন্দী মুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিল হামাস

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস গাযায় জিম্মি থাকা ইসরায়েলি নাগরিকদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। গাযায় যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রথম ধাপে হওয়া সমঝোতার ১৬ দিন পর এমন সম্মতি জানিয়েছে সংগঠনটি। এ ক্ষেত্রে হামাস একটি শর্ত বেঁধে দিয়েছে। আর তা হলো, সমঝোতা চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করার আগে ইসরায়েলকে প্রথমে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির অঙ্গীকার করতে হবে। পাশাপাশি প্রথম ধাপে ছয় সপ্তাহের সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। আলোচনাটি গোপনীয় হওয়ার কারণে ওই সূত্র তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছা জানিয়েছেন।




গল্প

# চুক্তি

## পল্লীকবি জসীম উদ্দীন

গ্রামের মধ্যে সবচাইতে বড়লোক আমাদের খাঁ সাহেব; কিন্তু বড়ই কৃপণ। একটি পয়সাও তার হাতের কানি আঙুল গড়িয়ে পড়ে না। তার বাড়িতে কেহ কোনোদিন দাওয়াত খেতে পায় না।

সেবার তার ছেলের বিবাহ। সমস্ত গ্রামের লোক এসে ধরল, "খাঁ সাহেব! এবার আর আপনাকে ছাড়ব না; আপনার ছেলের বিবাহ। আমাদিগকে দই চিনি খাওয়াতে হবে।"

খাঁ সাহেব অনেক ওজর আপত্তি করল, "এ বছর ক্ষেতের ধান তেমন হয় নাই। পাটের দামও কম। দই-চিনিটা বাদ দাও। আমি তোমাদেরকে মাছ-ভাত খাওয়াব।"

গ্রামের লোকেরা কি আর তা মানে? অগত্যা খাঁ সাহেবকে রাজি হতে হল ।

কিন্তু গ্রামের সমস্ত লোককে দই-চিনি খাওয়াতে গেলে অনেক টাকা খরচ হবে। সারারাত এই খরচের চিন্তায় তার ঘুম হল না। শেষরাতে খাঁ সাহেব মনে মনে একটি ফন্দি আঁটল।

সকাল হলে সে মতি গোয়ালার বাড়ি গিয়ে তাঁকে ঘুম হতে জাগাল। মতি চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল, "তা খাঁ সাহেব কী মনে করে?"

খাঁ সাহেব বলল, "দেখ মতি! কাল আমার ছেলের বিয়ে। তোমাকে দশ মণ দই করে দিতে হবে।"

মতি খুশি হয়ে বলল, "সে আর এমন বেশি কথা কী? আমি ঠিক সময়ে দই বানিয়ে হাযির হব।"

খাঁ সাহেব গোয়ালাকে আরও একটু নিকটে ডেকে বলল, "দেখ মতি! এর মধ্যে আমার একটি কথা আছে। তুমি আমাকে একমণ মিষ্টি দই বানিয়ে দিবে। আর বাদ বাকি নয় মণ দই টক করে তৈরি করবে।"

মতি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "খাঁ সাহেব! সবাই তো মিষ্টি দই চায়। আপনি টক দই চান কেন?"

খাঁ সাহেব হেঁসে বলল, "দেখ মতি! তুমি বুঝবে না। তুমি যদি আমাকে সব মিষ্টি দই দাও, তবে দশ মণে কুলাবে না। গ্রামবাসীরা যেভাবে রাক্ষসের মতো খায়, বিশ মণ দই না হলে তাদের পেট ভরাতে পারব না। সে অনেক টাকার খরচ।"

গোয়ালা হেঁসে বলল, "আচ্ছা! আপনি যেভাবে বলছেন, সেভাবেই দই তৈরি করব।"

খাঁ সাহেব গোয়ালার কানে কানে বলল, "দেখ মতি! আরও একটা কথা, তোমার টক দই খেয়ে গ্রামের লোকেরা যখন নিন্দা করবে, তখন আমি তোমাকে খুব বকব। কিন্তু তুমি একটি কথাও বলতে পারবে না। এজন্য আমি তোমার টক দইয়ের প্রতি মণের দামে আরও চার আনা করে ধরে দিব। মনে থাকে যেন, আমি টক দই আনার জন্য তোমাকে যতই গালাগালি করব, তুমি টু শব্দটিও করবে না।"

মতি হেঁসে বলল, "আচ্ছা।"

নিমন্ত্রণের দিনে গ্রামের লোক খেতে এসেছে। মাছ-ভাত খাওয়ার পর প্রত্যেকের পাতে যখন মিষ্টি দই পড়ল; তখন সকলেই খাঁ সাহেবের তারিফ করতে লাগল। কিন্তু এক চামচ দুই চামচ করে যখন পাতে পাতে টক দই পড়তে লাগল, তখন সকল লোকের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। কেউ খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল, কেউ খাঁ সাহেবকে গালি দিতে লাগল।

খাঁ সাহেব তখন গোয়ালাকে ডেকে খুব রাগের সঙ্গে বলল, "দেখ! তুমি এত টক দই দিয়েছ কেন?"

গোয়ালা কোনো কথা বলে না। খাঁ সাহেব গলা আরও চড়িয়ে বলে, "কী, এখন যে মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। বেটা পাজি নচ্ছার এত টাকা দাম নিয়ে আমাকে টক দই দিয়েছিস? দাঁড়া, তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি!"

গোয়ালা তখনও কোনো কথা বলে না।

খাঁ সাহেব আরও রেগে বলে, "বেটা পাজি নচ্ছার! ভেবেছিস তোকে আমি এমনি এমনি ছেড়ে দিব? এত লোকের খাওয়া নষ্ট করলি, তার শাস্তি তোকে দিব না?"

তাঁকে এইভাবে বকতে বকতে খাঁ সাহেবের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাগের মাথায় গোয়ালার মুখে বিরাশির দশ আনা ওজনের এক থাপ্পড় মেরে বসল ।

মার খেয়ে গোয়ালা নিমন্ত্রিত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, "দেখেন, সব লোকজন আপনারা দশজনে ইহার বিচার করেন। খাঁ সাহেব কুরআন শরীফ মাথায় নিয়ে বলুন, দই টক হলে আপনারা কম খাবেন, তাই আমাকে টক দই আনার জন্য বায়না দিয়েছিলেন কি না?"

শুনে গাঁয়ের সকল লোক খাঁ সাহেবের উপর ভীষণ চটে গেল। খাঁ সাহেব এর মেজাজ নরম হয়ে এলে কানে কানে আস্তে গোয়ালাকে বলল, "কিরে মতি, তোর সঙ্গে কথা হয়েছিল না, টক দই দেখে আমি খুব রাগারাগি করব, তুই কিছু বলবি না? এখন কেন সকল কথা ফাঁস করে দিলি?"

গোয়ালা আরও আস্তে আস্তে খাঁ সাহেবকে বলল, "আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, আপনি যতই গালাগালি করবেন, যতই আমাকে বকবেন, ধমকাবেন আমি টু শব্দটিও করব না। যতক্ষণ আপনি রাগারাগি করতে থাকবেন আমি কিছুই বলব না। কিন্তু আপনি আমার মুখে বিরাশির দশ আনার একটি থাপ্পড় মারলেও যে আমি কথা বলব না, একথা তো চুক্তিতে ছিল না।"

গ্রামের সমস্ত লোকের কাছে খাঁ সাহেবের মাথা হেঁট হল।

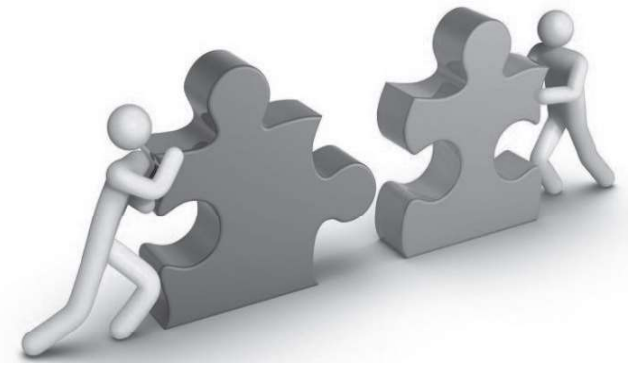

# যথেষ্ট

## মুহাম্মাদ উসমান গণি

প্রিয়নবীর প্রিয় সাহাবীরা, বসে আছেন তাদের প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে। শুনছেন প্রিয় প্রিয় কথাগুলো। বলছেন তিনি সুমিষ্ট স্বরে, মোহিনী ভঙ্গিতে। বলছেন দ্বীন ও দুনিয়ার কথা। তিনি বলছিলেন, রিয়ামুক্ত ইবাদাত আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তারা নিষ্ঠাবান, পরহেযগার ও প্রচার বিমুখ। কখনো নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের শান শওকত জাহির করার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এরকম মানুষগুলো থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাদের অনুপস্থিতি কাউকে ভাবায়না। তারা থাকেন দীনহীন ও ফকীরবেশে। মুগ্ধ হয়ে সাহাবায়ে কিরাম শুনছিলেন নবীজির অমীয় বাণী। জিজ্ঞাসিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এরকম লোকের দেখা পাওয়া যাবে কোথায়?

নবীজি বললেন, হ্যাঁ, এমন একজন লোকের সন্ধান আমার কাছে আছে। যার নাম ওয়ায়েস আল কারণী। সাহাবায়ে কিরাম আরও কৌতুহলী হয়ে জানতে চান, কে সে ওয়ায়েস কারণী?

এবার নবীজি বলতে শুরু করলেন, সে হবে মধ্যম গড়ণের। চওড়া বুকের অধিকারী। গায়ের রং ধুসর বর্ণের। দাড়ি থাকবে তার বুক পর্যন্ত। চোখ থাকবে অবনমিত। তাকে দেখতে পাওয়া যাবে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করতে। সে অধিক ক্রন্দনকারী হবে। জামা-কাপড় বলতে তার কাছে থাকবে দুটিমাত্র চাদর। একটি বিছানোর জন্য অন্যটি গায়ে জড়ানোর জন্য।

দুনিয়াবাসীর কাছে তার মূল্য না থাকলেও আকাশবাসীর নিকট সে খুবই সম্মানের পাত্র। সাহাবীরা আরও জানতে চান, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে চেনার সহজ উপায় কী?

নবীজি বলেন, তার ডান কাঁধের নিচে একটি সাদা চিহ্ন থাকবে।

কিয়ামতের দিন সৎকর্মশীলদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে যাও। কিন্তু ওয়ায়েস আল কারণীকে বলা হবে, তুমি রাবীআ ও মুদার গোত্রের মানুষের পরিমাণ গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করো।

কথা বলার একপর্যায়ে নবীজি ﷺ হযরত উমর ফারুক ও হযরত আলী (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তার কাছে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ চাইবে।

এরপর হযরত উমর ফারুক (রা.) ও হযরত আলী (রা.) দীর্ঘ দশ বছর ওয়ায়েস আল কারণীকে খুঁজলেন কিন্তু কোনো সন্ধান পেলেন না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব মুসলিম জাহানের খলীফা। একবার হজ্জের সময় খলীফা আবূ কাইস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে হাজীবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কি ওয়ায়েস নামে কোনো লোক আছে?

একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি কোন ওয়ায়েসের কথা বলছেন আমার জানা নেই। তবে আমার এক ভাই আছে, যার নাম ওয়ায়েস। কিন্তু সে তো খুব গরীব ও দীনহীন একজন রাখাল। তার তেমন নাম ডাক নেই। এলাকার মানুষই তাকে ঠিকমতো চিনে না। সে হিসেবে মক্কা পর্যন্ত তার পরিচিতি আসার কথা নয়। আর আপনিও তাকে চেনার কথা নয়।

হযরত উমর (রা.) লোকটিকে কাছে ডেকে নিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তোমার সে ভাই? বৃদ্ধ বললেন, সে আমাদের সাথেই এসেছে। খুব সম্ভব সে আরাফার ময়দানে আছে।

উমর ইবনুল খাত্তার সাথে সাথে হযরত আলীকে সাথে নিয়ে ছুটে গেলেন আরাফার ময়দানে। গিয়ে দেখেন সেখানে একজন লোক একটি খেজুর গাছের নিচে নামাযরত অবস্থায় রয়েছেন। নামায সম্পন্ন করতেই হযরত উমর ও হযরত আলী তাঁকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের জবাব দিলেন। এবার উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি উত্তর দেন আমি আমার জনপদের এক রাখাল। সাহাবী দুজনই তাঁর নাম জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন আমার নাম আবদুল্লাহ। তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ, আমরা সবাই আবদুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দা। কিন্তু আপনি আপনার এই নামটি বলুন যা আপনার মা রেখেছেন। একথা শুনে ওয়ায়েস আল কারণী বললেন, আচ্ছা আপনারা কারা বলুন তো? আর আপনারা কীই বা চান আমার কাছে?

সাহাবীদ্বয় বললেন, নবীজি ﷺ আমাদেরকে ওয়ায়েস আল কারণী সম্পর্কে কিছু নিদর্শন বলে গেছেন। তার মধ্যে অনেকটা আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি কী দয়া করে আপনার ডান কাঁধটুকু দেখাবেন? তিনি কাঁধের কাপড় সরালে নবীজির ভবিষ্যতবাণীর পুরোটাই সত্যে পরিণত হলো। ঠিকই তাঁর ডান কাঁধের নিচে সাদা চিহ্ন দেখা গেল। সাহাবী দুজন খুব খুশি হলেন এবং তার কাঁধের সাদা চিহ্নে চুম্বন করলেন। তাঁর কাছে মাগফিরাতের জন্য দুআ চাইলেন।

ওয়ায়েস আল কারণী এবার তাদের বললেন, আচ্ছা এবার আপনাদের পরিচয় দিন তো! আপনারা আসলে কারা?

হযরত আলী বললেন, তিনি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব, আর আমি হলাম আলী ইবন আবূ তালিব।

একথা শুনতেই ওয়ায়েস আল কারণী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

উমর (রা.) বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মক্কার বাজার থেকে কিছু কিনে আনতে চাই আপনাকে হাদিয়া দেবো বলে। কারণ, আপনার সম্পর্কে নবীজি ﷺ অনেক কিছুই বলেছেন। আপনাকে হাদীয়াস্বরূপ কিছু দিতে পারলে আমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। ওয়ায়েস আল কারণী বললেন, আপনারা কষ্ট করবেন না। হয়তো আমার সাথে আপনাদের আর দেখা হবে না। আর আমার কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই। কারণ আমার দুটি চাদর রয়েছে। আমার রয়েছে একজোড়া জুতা। তাতে আমার চলে যায়। আর আমার গোত্রের উট রাখাল হিসেবে আমি যে পারিশ্রমিক পাই তা আমার জন্য যথেষ্ট। সাথে সাথে ওয়ায়েস আল কারণী তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁর গন্তব্যের দিকে আর উমর ইবনুল খাত্তাব ও আলী (রা.) চলে গেলেন মক্কা অভিমুখে।

## কারবালার প্রান্তরে
### ইসমাঈল আলী সাহান

আমরা জানি সেই কাহিনী
ন্যায়ের চাবি রাখতে যিনি
করেছেন উঁচু শির
সব জান্নাতীর ইমাম তিনি
হোসাইন মহাবীর।

ইসলাম কায়িম করতে গিয়ে
পরিবার আর নিজকে নিয়ে
হয়েছেন কুরবানী
কী যে পাষাণ দেয়নি ওরা
একটুখানিও পানি!

রাসূল পাকের কলিজার যেই
যার মায়াতে রাসুল নিজেই
নিতেন নিজের কাঁধে
কারবালার পথ পড়লে মনে
কার মনটা না কাঁদে?

ছটফট কিংবা জীবন ত্যাগে
ব্যথায় ডাকা ছিল মেঘে
কারবালার প্রান্তরে
মুমিন হৃদয় যেই কাহিনী
রেখেছেন অন্তরে।

## নবীকে ভালোবাসি
### মো. রইছ উদ্দিন

নবী তোমায় ভালোবাসি, অনেক বেশি জীবন থেকে।
ওগো সুরের সুর
আলোকের যে নূর
ঠেলে দিওনা দূর
থাকি যেন তোমার পাশে, নাওগো আমায় কাছে ডেকে।

করবো যে রওজা যিয়ারত, পাবো আমি শান্তি মনে।
ইচ্ছা আছে তাই
যেনো সেথায় যাই
আর না কিছু চাই
খোদার কাছে দুআ করি, নামায পড়ি প্রতিক্ষণে।

হাজার হাজার হাজী গাযী, যায় যে তারা নবীর বাড়ি।
কাটে সেথায় দিন
চলে যায় রাত-দিন
বাজে খুশির বীণ
করবো আমি সালাম গিয়ে, বিশ্ব নবীর রওদায় দাঁড়ি।

একবার শুধু মদিনা যাই, মনের দুঃখ চলে যাবে।
রওদায় চুমু খাই
মনে শান্তি পাই
পাপ সব মুছে ভাই
আত্মা পরিতৃপ্ত হবে, স্বপ্ন পূর্ণতা যে পাবে।

## সময়ের আক্ষেপ-৬
### এস এম মনোয়ার হোসেন

দিনে দিনে মানুষের
বদলায় ব্যবহার
আসল মানুষ হতে
করি নিজ সমাচার।

প্রয়োজনে কতজনে
তোমায় করবে পুজা
স্বার্থ হাসিল হলে
ভাববে তোমায় বোঝা।

না চেয়ে কারোর পানে
যদি বা যোগ্য হও
আসবে সুযোগ যত
সেই আশাতেই রও।

অসুখে অলস দেহ
বিছানায় পড়ে রয়
কোথায় কেটেছে বেলা
তখন কি মনে হয়?

যোগ্য হলেই তবে
জীবনে পাবে কদর
মূল্যায়নের সাথে
বেড়ে যাবে সমাদর।

## দ্বীনের ফুল
### ছাদির হুসাইন

পড়বো সালাত
গড়বো জীবন
ধরবো আলোর পথ
লড়বো ন্যায়ে
করবো আমল
থাকবো কাজে সৎ।

রাখবো মনে
খোদার কথা
আঁকবো দ্বীনের ফুল
জীবন ভরেই
ডাকবো সদা
আল্লাহ রাসুল।

## লিখি তোমার শান
### রেদওয়ান আলম হৃদয়

ছন্দে ছন্দে, সুরে সুরে
লিখি তোমার শান।
পাক-পাখালি, উড়ে উড়ে-
গায় যে-তোমার গান।

তুমি হলে মা আমিনার
হৃদয় বাগের ফুল
তোমার নামে দুরূদ পাঠাই
মুহাম্মদ রাসুল।

যতোই ভাবি তোমায় নিয়ে
ভেবে পাইনা কুল।
তোমার নামের প্রেমের মাঝে
আমি হই ব্যাকুল।
উদাস এই মন হয় উদাসী
খোঁজে একটু ঠাঁই।

এই জীবনে চাই না কিছুই
তোমার দিদার চাই।
ওগো নবী ধ্যানের ছবি
দু'জাহানের মূল।
তোমার নামে দুরূদ পাঠাই
মুহাম্মদ রাসুল।

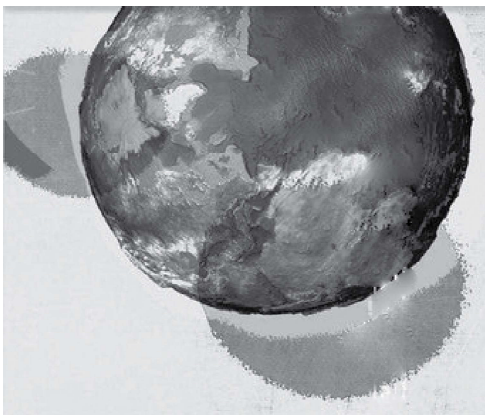

# মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিস্ময়কর কয়েকটি তথ্য

মহাবিশ্ব মহান আল্লাহ তায়ালার বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রাচীনকাল থেকে অবিরাম গবেষণার মাধ্যমে মানুষ মহাবিশ্ব সম্পর্কে সামান্য তথ্য উদঘাটন করতে পেরেছে। আসুন, জেনে নিই এর কয়েকটি-

★ কখনো কি মাথায় প্রশ্ন জেগেছে, মহাশূন্যের ঘ্রাণ কেমন? কতিপয় কৌতুহলী মানুষের মনে কিন্তু ঠিকই এই প্রশ্ন জেগেছে! আর তারা বিভিন্ন মহাকাশচারীদের অভিজ্ঞতা শোনার পর এর উত্তর বের করেছেন। আমরা প্রায় সবাই ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সাথে পরিচিত, তাই না? জ্বী, হ্যাঁ। ওয়েল্ডিংয়েরর কাজের সময় এর আশেপাশে থাকলে যে ঘ্রাণ পাওয়া যায়, মহাশূন্য বা স্পেসের গন্ধটা ঠিক অমন।

★ পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৩ আলোকবর্ষ দূরে একটা গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যার পুরো পৃষ্ঠটাই নাকি "Burning Ice" এ আবৃত! খটকা লাগছে? আসল ঘটনাটা হচ্ছে, এই গ্রহের পৃষ্ঠে প্রচণ্ড চাপের কারণে পানি কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে, আর গ্রহ পৃষ্ঠে তাপমাত্রা অনেক বেশি বলে এই জমাট বরফ থেকে বাষ্প নির্গত হয়। তাই বিজ্ঞানীরা একে বলছেন "Burning Ice"।

★ আমরা যে সুন্দর পৃথিবীতে বাস করছি, তাও কিন্তু একটা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে পারে। তবে এর আগে পৃথিবীকে বেশ শক্ত কিছু নিয়ম মানতে হবে। তারই মধ্যে একটি হলো পৃথিবীর নিজেকে কোনোভাবে মিনিমাইজ করে একটা মার্বেলের আকারে পরিণত করতে হবে। যদি কোনোভাবে এটা হয়ে যায়, তবে পৃথিবীও সর্বগ্রাসী ছোটখাট একটা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর স্রষ্টা, সেহেতু পৃথিবীর অবশ্য নিজের কিছুই করার নেই!

★ সচরাচর পানি ফুটানোর সময় আমরা কী দেখি? বুদবুদ আকারে অনেকগুলো পানির ফোঁটা পাত্রের উপরের দিকে উঠে এসেছে। কিন্তু কেউ যদি মহাকাশে যেয়ে কোনোভাবে পানি ফোটানোর চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু এ ঘটনা ঘটবে না। অনেকগুলোর পরিবর্তে একটামাত্র দানবাকৃতির বুদবুদ উঠে আসবে। বাতাস ও বলের গতিবেগ এর কারণ।

★ রাতের পরিষ্কার আকাশে আমরা যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখি, তাদের অনেকেই হয়তো মৃত। আলো বিকিরণ করতে করতে, ধীরে ধীরে তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি তারা মৃতই হয়, রাতের আকাশে তাদের দেখি কীভাবে আমরা? কারণ এসব নক্ষত্রের বেশিরভাগই আমাদের থেকে শতকোটি আলোকবর্ষ দূরে। সেখান থেকে আলো এসে পৌঁছাতে তো সময় লাগবে, তাই না? হ্যাঁ, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে তাদের নিঃসৃত আলো আমরা এখন রাতের আকাশে দেখছি, এই এতদিন পরে!

★ এই যে মহাবিশ্বের বিশালতা নিয়ে আমরা কথা বলছি, মহাবিশ্ব কিন্তু তার চেয়েও বিশাল! বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি রূপে আছে। আমাদের এই মহাবিশ্ব কিন্তু সম্প্রসারণশীল। এই প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মাঝে আঠার মত কাজ করছে ডার্ক ম্যাটার। কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি হয়তো কোনোদিনই পরিমাপ করা সম্ভব হবে না। যদিও বিজ্ঞানীরা এখনই হাল ছাড়তে নারাজ।

★ কেউ কখনোই মহাবিশ্বের একদম শেষ প্রান্তে চলে যেতে পারবে না। তাই কারো মনে যদি শখ জাগে যে মহাবিশ্বের শেষ মাথায় কী আছে তা দেখার, তার সে আশায় গুঁড়ে বালি। যদি কখনো কেউ এই মহাবিশ্বের একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরলরেখা বরাবর হাঁটতে থাকে, তবে অনন্তকাল হাঁটার পর সে আবার তার শুরুর জায়গাতেই ফেরত আসবে।

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

# বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

**১০১. شَيْخٌ (শাইখুন):** বাংলা শাইখুন/শাইখুন/শাইখ/শেখ। বয়োবৃদ্ধ, পথপ্রদর্শক, নেতা, প্রধান, অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। যেমন- শাইখুল হাদীস।

**১০২. شَرِيْعَةٌ (শারীআতুন):** বাংলা শরীআত। পথ-পদ্ধতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, খোদায়ী বিধান। ইসলামী জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা।

**১০৩. شَرَابٌ (শারাবুন):** বাংলা শরাব। পানীয় দ্রব্য, পানযোগ্য দ্রব্য, মদ, মদ্য, সুরা। বাংলায় শরাব দ্বারা মদ বুঝানো হয়।

**১০৪. شَرْطٌ (শারতুন):** বাংলা শর্ত। অঙ্গীকার, আগাম চাহিদা।

**১০৫. شَانٌ (শানুন):** বাংলা শান। মান, মর্যাদা, মহিমা, বড়াই। যেমন- নবীর শানে কটুক্তি সহ্য করা হবে না।

*গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান*



# আন্দালিব ভাই সমীপে...

**প্রিয় আন্দালিব ভাই!**

আমি মাসিক পরওয়ানার একজন নিয়মিত পাঠক। পরওয়ানা আমার খুব প্রিয় একটি পত্রিকা। প্রতি মাসের গল্পগুলো আমার প্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ। পরওয়ানা হাতে পেয়ে নিমিষেই পড়ে ফেলি গল্পগুলো। জুন সংখ্যায় প্রকাশিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুরন্ত পথিক ও রাজকন্যা গল্পটি খুব চমৎকার হয়েছে। লেখক গল্পের মাধ্যমে আমাদের শিশু-কিশোরদের একটি জ্ঞানগর্ভ বার্তা দিয়ে গেছেন। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ শিক্ষামূলক এরকম গল্প উপহার দেওয়ার জন্য।

**সাজিদ আওফী সাহিল**
সদর, কুমিল্লা

-আন্দালিব ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় সাহিল। পরওয়ানার গল্প তোমার কাছে ভালো লাগে শুনে আমরাও খুশি হলাম। গত মাসে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্পটি তোমার বেশ ভালো লেগেছে তা শুনে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগলো। পরওয়ানার সাথে থাকার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

**প্রিয় আন্দালিব ভাই!**

আসসালামু আলাইকুম,কেমন আছেন? আশাকরি ভালো আছেন। আমি পরওয়ানা একজন নিয়মিত পাঠক। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে আমি নিয়মিত পরওয়ানা পড়ে যাচ্ছি।। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আবাবিল ফৌজের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেয়েছিল। ভেবেছিলাম আমার আবেদন মনে হয় আন্দালিব ভাই সমীপে পৌঁছেনি। অবশেষে গত মে সংখ্যায় 'আবাবীল ফৌজের সদস্য হলো যারা'এর পাতায় আমার নাম দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমাকে আবাবীল ফৌজের সদস্য করায় আন্দালিব ভাইকে ধন্যবাদ।

**মো. আজরফ হোসেন জামী**
হযরত শাহজালাল দারুল কুরআন মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই, তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তুমি অনেক আগে আবাবীল সদস্য হওয়ার আবেদন করেছো এবং তা আমাদের কাছে পৌঁছেছেও সময়মতো। কিন্তু আরও আগে যারা আবেদন করেছেন তাদেরকে সদস্য করার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেই যা বিলম্ব হলো। আশাকরি তুমি আন্দালিব ভাইয়ের উপর কোন অভিযোগ আর মনে রাখবেনা। তুমি সদস্য হতে পেরে আনন্দিত হয়েছো শুনে আমরাও খুশি হলাম। তুমি নিয়মিত লিখবে আমাদের। তোমার বন্ধুদেরকেও সদস্য হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইলো।

**প্রিয় আন্দালিব ভাই!**

আমি পরওয়ানার একজন নিয়মিত পাঠক। আমি খুব মনোযোগ সহকারে পরওয়ানা পড়ি। আবাবীল ফৌজের গল্পগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। জুন মাসে প্রকাশিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্পটি খুব ভালো লেগেছে। রাজকন্যাও বেশ চমৎকার হয়েছে। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই এরকম মজাদার গল্প উপহার দেওয়ার জন্য।

**আবূ ফারহান**
সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সেনানিবাস, সিলেট

-আন্দালিব ভাই, তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আবাবীলের গল্পগুলো তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। তুমিও লিখতে পারে আমাদের। তোমাদের লেখা নিয়েই সাজানো হয় আবাবীলের পুরো অংশ। তোমার জন্য রইলো অনেক অনেক শুভকামনা।

**প্রিয় আন্দালিব ভাই!**

আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। পরওয়ানা আমার প্রিয় একটি ম্যাগাজিন। পরওয়ানায় ছোটদের পাতা আবাবীল ফৌজ আমার খুব ভালো লাগার একটি বিভাগ। আমার দাবি হলো এ বিভাগে ছড়া-গল্প যেন আরো বেশি বেশি ছাপা হয়। অদ্ভূত পৃথিবীর আইটেম আরও বাড়ালে আমরা অনেক অজানা জিনিস জানতে পারবো। আশা করি আমার ক্ষুদ্র চিঠির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সদয় বিবেচনা করবেন।

**আব্দুল্লাহ আল রাফী**
স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজ, ইসলামপুর, সিলেট

-আন্দালিব ভাই, তোমার চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবাবীল ফৌজ তোমার প্রিয় বিভাগ জেনে খুশি হলাম। তোমার দাবির বিষয়গুলো অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। তোমার চিঠির জন্য মুবারকবাদ।

## সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।


**আন্দালিব ভাই**
**পরিচালক, আবাবীল ফৌজ**
**মাসিক পরওয়ানা**
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
**সিলেট অফিস:** পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

# আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
-কাজী নজরুল ইসলাম

হিজরী ১৪৪৬। বছর ঘুরে আবারও ফিরে এলো মুহাররাম মাস। সকলকে হিজরী নববর্ষের শুভেচ্ছা। মুহাররাম মুমিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাস হিসেবে বিবেচিত। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে এ মাসেরই দশ তারিখ, যা আশুরা হিসেবে খ্যাত। এর মধ্যে কারবালার প্রান্তরে নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) এর সপরিবারে শাহাদাত বরণ সবচাইতে হৃদয়বিদারক ঘটনা।

আশুরার শোক বিহ্বল ক্ষণে শোকাবহ কারবালার স্মৃতি মুমিন মাত্র ব্যথিত করে। আহলে বাইতের প্রতি ক্ষমতালোভী ইয়াযীদের নিষ্ঠুরতায় কারবালার ময়দান সেদিন রক্তাক্ত হয়েছিল। কারবালার সেই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে জাতীয় কবি লিখেছেন-

দুই হাত কাটা তবু শের নর আব্বাস
পানি আনে মুখে হাঁকে দুশমন ও সাব্বাস।
দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দভি দামামা
হাঁকে বীর, শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।

আশুরা কিন্তু আমাদেরকে সত্যে অটল থাকায় শিক্ষা দিয়ে গেছে। ইমাম হুসাইন (রা.) সপরিবারে শাহাদাত বরণের মধ্য দিয়ে এ কথার আহ্বান করে গেছেন, যে মস্তক আল্লাহর কাছে নত হয়েছে সে মস্তক কখনো বাতিল শক্তির কাছে নত হতে পারে না। তিনি প্রমাণ করে গেছেন প্রয়োজনে শির কুরবান দেব কিন্তু আমামা তথা পাগড়ী রক্ষা করব। এ পাগড়ী দ্বারা হকপন্থা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে মুমিনরা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। আমরাও যেন কারবালার শিক্ষায় আমাদের জীবনকে দ্বীনের পথে উৎসর্গ করতে পারি। ইমাম হুসাইনের আদর্শে যেন গড়তে পারি আমাদের জীবন।

আবাবীল বন্ধুরা! তোমরা আবাবীল ফৌজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেকেই পুরস্কৃত হয়েছ। কিন্তু তোমাদের পূর্ণ ঠিকানা না থাকায় কারো কারো পুরস্কার আমরা পাঠাতে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই প্রত্যেক লেখার সাথে পূর্ণ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দিতে ভুল করবে না। আর মনে রাখবে, আবাবীল ফৌজের জন্য নির্ধারিত ইমেইল রয়েছে। অন্য ইমেইলে লেখা পাঠালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পরিশেষে সবাই যেন সুস্থ থাক, নিরাপদ থাক, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি।

**শুভেচ্ছাসহ**
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

# বলতো দেখি?

## এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
২. কাবার গিলাফ প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপন হয় কত হিজরীতে?
৩. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ভারত সফর করেন কবে?
৪. তাফসীরে মাযহারীর লেখক কে?
৫. কারবালার ঘটনা সংঘটিত হয় কত হিজরীতে?

## গত সংখ্যার উত্তর

১. আন্তোনিও গুতেরেস
২. ১৮৬১ সালে
৩. ১৯ মে ২০২৪
৪. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
৫. মাতাফ

**যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]**

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সাদিয়া আক্তার, গৌরকরণ, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মো: মাসুদুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোবারক হোসাইন, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার # মো: নুর আলম, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # সালমান আহমাদ ইলিয়াস, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মোঃ শাহজাহান আলম, আমতৈল, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শাহরুন নাহার জুঁই, হাটুভাঙা আলিম মাদরাসা, সারকারখানা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মোঃ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার কুলাউড়া মৌলভীবাজার # মোঃ লালন আহমদ রাজু, নরসিংপুর আদর্শ হাঃ দাখিল মাদরাসা, দোয়ারা বাজার সুনামগঞ্জ # এম আলী হোসেন সুয়েজ, সুবিদবাজার, সিলেট # পলি আক্তার, হযরত শাহখাকী (রহঃ) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

# শব্দকল্প

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ৩ | | ৪ |
| ৫ | | | | | |
| ৬ | | ৭ | | | |
| | | ৮ | ৯ | ১০ | |
| ১১ | | | | | |

### সূত্র : পাশাপাশি

১। ১০ই মহররম যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ ৫। ধুলা, পরাগ ৬। শোয়া ৮। ন্যায্য দাবিদার ১১। হিজরী সনের প্রথম মাস।

### সূত্র : উপর-নীচ

১। ছোয়া, স্পর্শ ২। জয় ৩। দীপ্তি, প্রভা ৪। পথপ্রদর্শক ৭। নালা, খাল ৯। রাজস্ব ১০। মূল্য।

## গত সংখ্যার সমাধান

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ঈ | দু | ল | আ | দ | হা |
| মা | লা | | যা | | ম |
| ন | ল | | ন | গ | দ |
| | | না | | জ | ল |
| কু | র | বা | নী | | মা |

**গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী**
**মো. নাছির উদ্দিন তালহা**
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

**শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)**
এম আলী হোসেন সুয়েজ, সুবিদবাজার, সিলেট # সাদিয়া আক্তার, গৌরকরণ, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মো: মাসুদুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান,বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মো: নুর আলম,বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # সালমান আহমাদ ইলিয়াস, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # শাহরুন নাহার জুঁই, হাটুভাঙা আলিম মাদরাসা, সারকারখানা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

# বর্ণকল্প

### এ সংখ্যার বর্ণকল্প

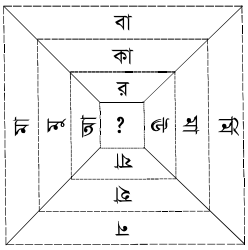


*বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।*

## গত সংখ্যার সমাধান

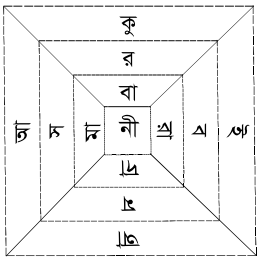


**গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী**
**মো. নাছির উদ্দিন তালহা**
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

**যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে**
মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (রহঃ) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী মৌলভীবাজার # পলি আক্তার,হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী মৌলভীবাজার # মো. সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মো. আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার কুলাউড়া মৌলভীবাজার # এম আলী হোসেন সুয়েজ, সুবিদবাজার, সিলেট # সাদিয়া আক্তার, গৌড়করণ, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো: মাসুদুর রহমান,বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোঃ রুহুল আমিন জুমান, বিসমিল্লাহ ভেরাইটিজ ষ্টোর, জালালপুর বাজার, সিলেট # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোবারক হোসাইন, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার # মো: নুর আলম, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # শাহ রহমত উল্লা কাজী নাসিম, চিলাউড়া দারুচ্ছুন্নাহ হাফিজিয়া আলিম মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # সালমান আহমাদ ইলিয়াস, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মোঃ শাহজাহান আলম, আমতৈল, কাদিপুর, কুলাউড়া,মৌলভীবাজার # আরাফাত জিন্নাহ, চিলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয়,জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ # শাহরুন নাহার জুঁই, হাটুভাঙা আলিম মাদরাসা, সারকারখানা,ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

## অদ্ভুত পৃথিবী

# সকোত্রা দ্বীপ



সোকোত্রা দ্বীপের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোন আশ্চর্য নেই পৃথিবীর বুকে। এটা নিজেই নিজের মধ্যে এক অন্যতম আশ্চর্য! মধ্য প্রাচ্যের দেশ ইয়ামানের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩৫৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সকোত্রা দ্বীপপুঞ্জ। মোট চারটি দ্বীপ মিলে এই দ্বীপপুঞ্জ যার মধ্যে সকোত্রাই আয়তনে সবচেয়ে বড়। সকোত্রার আয়তন প্রায় ৬৫৬০ বর্গকিলোমিটার। এটি প্রায় ৪৪,০০০ লোকের জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত একটি ছোট দ্বীপ মনে হতে পারে। কিন্তু যা এই দ্বীপটিকে অনন্য করে তুলেছে তা হলো, এই দ্বীপে জন্মানো গাছের সংখ্যা। অর্থাৎ, এই দ্বীপের গাছগুলো পৃথিবীর অন্যকোথাও খুঁজে পাবেন না এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ২০০৮ সালে ইউনেস্কো এই দ্বীপপুঞ্জকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' তকমা দেয়। এই সকোত্রা দ্বীপের বিচিত্র দর্শন গাছপালাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ড্রাগন গাছ। এই গাছটি দেখতে একেবারে ব্যাঙের ছাতার মতো। উচ্চতায় বড়জোড় ৭-৮ ফুট। এই দ্বীপে এলে চারপাশের পরিবেশ আর গাছপালা দেখে আপনার মনে হতেই পারে যে, আপনি হয়তো অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছেন!

## হাসতে জানি

### আমি সাঁতার জানি না!

পাগলা গারদের এক ডাক্তার তিন পাগলের পরীক্ষা নিচ্ছেন। পরীক্ষায় পাস করলে তিনজনকে পাগলা গারদ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, কিন্তু ফেল করলেই তিন বছরের জন্য আটকে দেওয়া হবে। ডাক্তার তিন পাগলকে একটা জলবিহীন ফাঁকা সুইমিং পুলের সামনে নিয়ে ঝাঁপ দিতে বললেন। প্রথম পাগল তৎক্ষণাৎ তাতে ঝাঁপ দিয়ে পা ভেঙে ফেলল। দ্বিতীয় পাগলটিও ডাক্তারের নির্দেশমতো তাতে ঝাঁপ দিল এবং হাত ভেঙে ফেলল। তৃতীয় পাগলটি কোনোমতেই ঝাঁপ দিতে রাজি হল না।

ডাক্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আরে, তুমি তো সুস্থ হয়ে গেছ! যাও, তুমি মুক্ত। তবে একটা কথা বল তো, তুমি পুলে ঝাঁপ দিলে না কেন?'

পাগলটি নির্দ্বিধায় জবাব দিল, 'দেখুন ডাক্তার বাবু, আমি সাঁতার একেবারেই জানি না!'

**সংগ্রহে: জুয়েল আহমদ**

প্রভাষক (অর্থনীতি),স্কলার্সহোম মেজরটলা কলেজ, ইসলামপুর, সিলেট

## আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

**৩৪৪৪. মাহফুজুর রহমান নিশান**
পিতা: শহীদ আহমেদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজ
গ্রাম: লামা ঝিংগাবাড়ি
ডাক: মুকিমগঞ্জবাজার
থানা: কানাইঘাট
জেলা: সিলেট

**৩৪৪৫. কাজী ফারহানা আক্তার সুমান**
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবু হানিফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

**৩৪৪৬. শাহ তামজীদ আহমদ**
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবু হানিফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

**৩৪৪৭. মোছা: রাবেয়া আক্তার রিমা**
পিতা: লাহিন আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: জগন্নাথপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: জগন্নাথপুর
ডাক: জগন্নাথপুর
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

**৩৪৪৮. আইমান হোসাইন জিসান**
পিতা: ফখরুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: নয়াগ্রাম
ডাক: বালিঙ্গাবাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

**৩৪৪৯. তুফাজ্জল হোসেন**
পিতা: আজিজুল হোসেন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ক্লাসিক স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: কালিকৃষ্ণপুর
ডাক: নূরজাহানপুর
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

**৩৪৫০. কাজী আহমদ আল জামী**
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবু হানিফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

**৩৪৫১. আবু নাসির অলিদ**
পিতা: ফয়জুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: দি সিলেট খাজাঞ্চিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: আজিমগঞ্জ
ডাক: দক্ষিণভাগ
থানা: বড়লেখা
জেলা: মৌলভীবাজার

**৩৪৫২. জাহিদ আহমদ**
পিতা: আলী হোসেন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল
গ্রাম: কালিকৃষ্ণপুর
ডাক: নূরজাহানপুর
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট




প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتلى داكا

# FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

# আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

আলিম জামাতে

## ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

**আমরা ভিন্ন কেন?**

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

**যোগাযোগ**

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

## হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

## দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

**প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের**

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

**ক্যাম্পাস** | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড ট্যুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

আল মারওয়ান ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস্

হজ্জ লাইসেন্স নং-১৫১২

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট

ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-২৫৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলমান

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

ATAB

ওমরাহ্ ইকোনমি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ থেকে ৫-১০ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মসজিদ-এ নববী থেকে ৫-৭ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ওমরাহ্ ভি.আই.পি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ ও মসজিদ-এ নববীর নিকটবর্তী ৪স্টার/৫স্টার হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ভারত এবং বাংলাদেশের যেকোনো এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীন (Domestic) টিকেট পাওয়া যায়।

আমাদের সেবাসমূহ

- হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিস
- সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং
- এয়ার টিকেট
- সৌদি আরবে নিজস্ব মোয়াল্লেম দ্বারা হজ্জ-ওমরাহ্ পরিচালনা করা
- প্রয়োজনে হুইল চেয়ারে যাত্রী বহন
- ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান

রশিদ এম্পোরিয়াম (২য় তলা), দরগাহ গেইট, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৩৭৮১৫৫৮০, ০১৬১১৪৮০৪৮০, ০১৭৪৭৫১৫১৫১

# লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
## LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

**বৈশিষ্ট্যাবলী**

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ



সফলতার ১১ বছর

**ভর্তি চলছে**

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

প্রতিবছর

- ১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
- ২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
- নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
- ১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

যোগাযোগ

মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মো. একলাছুর রহমান
সত্ত্বাধিকারী
মোবাইল: ০১৭৩৩-৯৪০৮৪০

মেসার্স

# প্রীতি আয়রণ এন্ড স্টীল

এখানে ফ্লেট বার, জেড বার, এঙ্গেল এম.এস শিট
এম.এস পাইপ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

মোবাইল দোকান: ০১৭১১-৮৪৭৪৯৫

৭৭২/৫ ঢাকা-সিলেট রোড (বেড়িরপার), মৌলভীবাজার-৩২০০

সৌদি সরকার কর্তৃক এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট

# লতিফ ট্রাভেলস

## লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB TDAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬১ লতিফ ট্রাভেলস স্থাপিত : ১৯৬২

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
**হজ্জ রেজিস্ট্রেশন** চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড । ভার্থখলা । সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview



# নকশি

এক্সক্লুসিভ কালেকশন

আর এম সিটি শপিং মল
কুলাউড়া
Nakshi Exclusive

মেসার্স
## হাজী আলাউদ্দিন ট্রেডার্স

উত্তর বাজার, কুলাউড়া

# মাথা

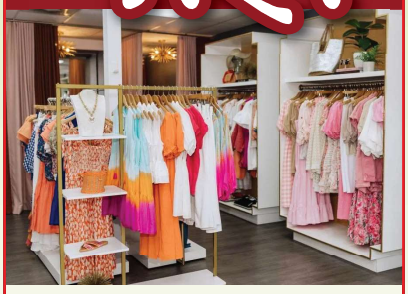

কুলাউড়া শপিং কমপ্লেক্স (নিচতলা)
কুলাউড়া

প্রোঃ আফজাল হোসেন সাজু ০১৭৪৪-৮১৫০৬৯

# LATIFI HANDS

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে



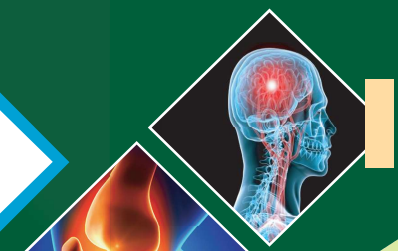



- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

# Al ISLAH
## CASH & CARRY

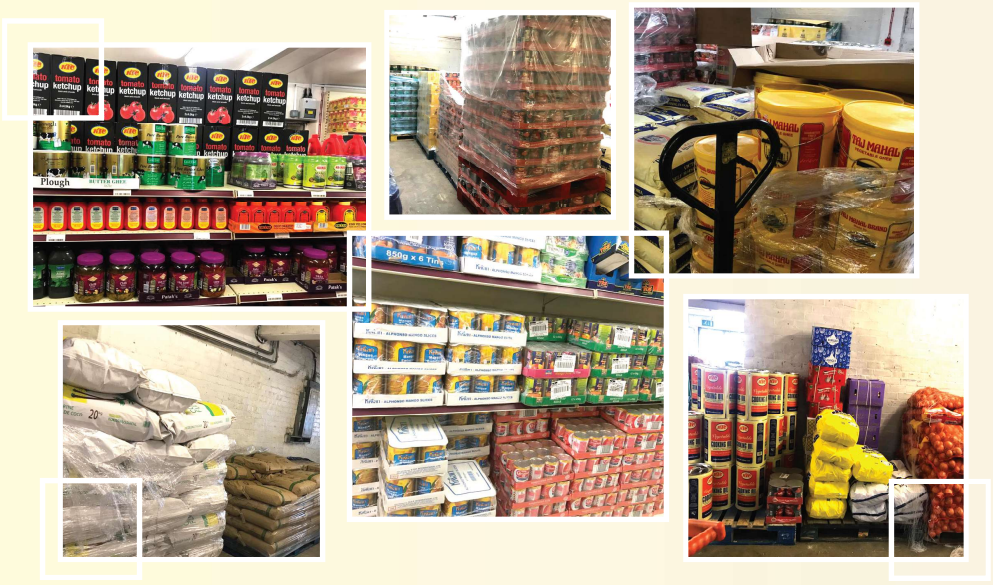

CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127